আজকার কথা

কাজী আবদুল ওদুদ

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক : সুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ

মূল্য এক টাকা

প্রিণ্টার : সুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
অবিনাশ প্রেস
[জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ]
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজ্ঞপ্তি

"আজকার কথা"র প্রথম প্রবন্ধে উল্লিখিত "শূন্যপুরাণে"র সন তারিখ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু তাতে আমার মূল বক্তব্য ক্ষুণ্ণ হয় না।

কৌতূহলী পাঠক "আজকার কথা"র সঙ্গে এর অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রকাশিত "পথ ও বিপথ" মিলিয়ে পড়তে পারেন।

কলিকাতা
জ্যৈষ্ঠ. ১৩৪৮

এই লেখকের আরো কয়েকখানি বই

নব পর্য্যায়—প্রথম খণ্ড

নব পর্য্যায়—দ্বিতীয় খণ্ড

রবীন্দ্রকাব্যপাঠ

সমাজ ও সাহিত্য

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ

পথ ও বিপথ

সূচী

বাংলার মুসলমানের কথা

উৎপত্তি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে প্রধানতঃ রিজ্‌লি, বেভেরলি, হাণ্টার প্রমুখ পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তক্রমে এই মত প্রাধান্য লাভ করে যে, বাংলার মুসলমান বাংলার হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তর থেকে উদ্‌ভূত—ইসলামের তলোয়ারের জোরে তারা মুসলমান হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষে এর প্রতিবাদ করেন মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারের দেওয়ান খোন্দকার মোহম্মদ ফজ্‌লে রব্বি তাঁর হকিকত্‌-ই-মুসলমানান্‌-ই-বাঙ্গালা নামক পার্শী গ্রন্থে। The Origin of the Musalmans of Bengal নাম দিয়ে এর একটি ইংরেজি অনুবাদও তিনি প্রকাশ করেন। এতে তিনি যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেন সে-সবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যুক্তিটি—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ইসলামের তলোয়ারের জোর কম ছিল না, কিন্তু সেখানে মুসলমানের সংখ্যা এত কম কেন?—সৈনিকরূপে, উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারীরূপে, সম্ভ্রান্ত বাসিন্দারূপে, বহু মুসলমান যে বাংলার বাইরে থেকে বাংলায় এসেছিলেন দেওয়ান সাহেবের গবেষণায় তা অনেকখানি প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে আরো দুটি ব্যাপারের উল্লেখ করা যেতে পারে:—পাঠান-শাসনকালে বাংলাদেশ পাঠান-বসতির একটা কেন্দ্র হয়ে

দাঁড়িয়েছিল। মোগলদের সঙ্গে তাদের যোঝাযুঝি যেমন প্রবল তেম্‌নি দীর্ঘকালব্যাপী হয়েছিল। সেই বিপুল পাঠানদল বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি, তাদের সন্তান-সন্ততি এদেশে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে। দ্বিতীয়তঃ, পলাশীতে মুসলমানের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পরে মীরজাফর প্রমুখ নবাবদের বহু পাঠান সৈন্য বিতাড়িত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহীদের মতো বহুদিন তারা এদেশে মজনু শা-র মতো নায়কদের অধীনে ফকির-বিদ্রোহ জিইয়ে রাখে। পরে পরে তারা এদেশের লোকসংখ্যায় মিশে যায়।—যাঁরা বাংলাদেশের 'সম্ভ্রান্ত' মুসলমান তাঁদের অনেকে যে বাংলার বাইরে থেকে এদেশে এসেছেন দেওয়ান সাহেবের এই মত প্রমাণসহ বলেই মনে হয়।

কিন্তু তবু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই (দেওয়ান সাহেব অবশ্য অস্বীকার করতে চেয়েছেন) যে, বাংলার প্রাচীন অধিবাসীদের ভিতর থেকে বহু লোক কালে কালে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে মুসলমানের সংখ্যা পুষ্ট করেছে। তার সঙ্গে একথাও মনে রাখ্‌তে হবে যে, বিজেতারা সাধারণতঃ বিজিত দেশ থেকে স্ত্রী গ্রহণ করে থাকে। এদেশে ইসলাম-প্রচারের মূলে তলোয়ার যে প্রধান শক্তি নয়, প্রধান শক্তি মুসলমান ফকির-দরবেশদের প্রভাব, ডক্টর এনামুল হকের গবেষণায় সম্প্রতি তার কিছু কিছু প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে। বাস্তবিক, বাংলায় মুসলমান দরবেশদের আগমন অতি

প্রাচীন ব্যাপার। সেন-রাজত্বের শেষভাগে এম্নি একজন দরবেশ বা শেখ নাকি এদেশে আসেন, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে রাজা লক্ষ্মণসেন তাঁর প্রসন্নতা বিধানের বিশেষ চেষ্টা করেন, 'সেকশুভোদয়ঃ' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে তার বর্ণনা রয়েছে। শ্রীহট্টে শাহ্‌জালালের ধর্ম্ম-প্রচারও সুবিদিত।

এই মুসলমান দরবেশদের ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যকরী হতে পেরেছিল যে সব কারণে, সে-সবের মধ্যে দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—প্রথমতঃ, বাংলার লোকদের পরিবর্ত্তনমুখী প্রকৃতি, দ্বিতীয়তঃ তদানীন্তন বাংলার ধর্ম্ম-সংঘর্ষ—যার অন্য নাম বৌদ্ধ-হিন্দু-সংঘর্ষ। বাংলা দেশকে যে এক সময়ে বৌদ্ধ দেশ বলা যেতে পারতো, অনেক ঐতিহাসিকের এই মত। সেই বিরাট বৌদ্ধ-সমাজ হিন্দুত্বের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-সমাজে মিশে যায়, এ মত বিচারসহ নয় বলেই মনে হয়। এদেশের নির্য্যাতিত সমাজ সেই দিনে বিজয়ী মুসলমানদের প্রতি কি দৃষ্টিতে চেয়েছিল, সে সম্বন্ধে রমাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণের একটী বর্ণনা সুবিখ্যাত :—

জাজপুর পুরবাদি[১] সোলসঅ ঘর বেদি[২]
বেদি লয় কেবোল দুর্জ্জন।
দখিন্যা[৩] মাগিতে যাঅ জার ঘরে নাহি পাঅ
সাঁপ দিয়া পুড়ায় ভুবন[৪] ॥

১। পুরবাদি—পূর্ব্ব প্রভৃতি দিক; ২। বেদি—বৈদিক; ৩। দখিন্যা—দক্ষিণা; ৪। ভুবন—ভবন।

মালদহে লাগে কর   না চিনে আপন পর
জালের[৫] নাঞিক দিসপাস।
বলিষ্ট হইল বড়   দস বিষ হয়্যা জড়
সদ্ধর্ম্মিরে[৬] করএ বিনাস॥
বেদ করে উচ্চারণ   বের্য়াঅ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিআ সভাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম   সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান॥
এইরূপে দ্বিজগন   করে সৃষ্টি সংহারন
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকণ্ঠে ডাকিআ ধর্ম্ম   মনেত পাইয়া মর্ম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার[৭]॥
ধর্ম্ম হৈল্যা জবন রূপি   মাথাএ ত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিকচ কামান[৮]।
চাপিয়া উত্তম হয়   ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার   হৈলা ভেস্ত[৯] অবতার
মুখেতে বলেত দম্বাদার[১০]।
যতেক দেবতাগণ   সভে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার[১১]॥

৫। জালের—আরবী জাল—ভুলভ্রান্তি, অপরাধ। ৬। সদ্ধর্ম্মি—বৌদ্ধ; ৭। অন্ধকার—পাঠান্তরে খনকার—ফার্সী খুনকার—রাজা, প্রভু; ৮। ত্রিকচ কামান—ফার্সী তীরকশ=ধনু, কামান=ধনু (ফার্সী)। ৯। ভেস্ত—বেহেশত=স্বর্গ; ১০। দম্বাদার—দম্‌মাদার, কথিত আছে ১৪৩৩ সালে প্রায় ৪০০ বৎসর বয়সে মাদার পীরের মৃত্যু হয়, ১১। ইজার—পাজামা।

ব্রহ্মা হৈল মহাঁমদ[১২] বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর[১৩]
আদম্ফ[১৪] হৈল সুলপানি।
গনেশ হইআ গাজী[১৫] কার্ত্তিক হৈল কাজি[১৬]
ফকির[১৭] হইল্যা যত মুনি॥
তেজিয়া আপন ভেক[১৮] নারদ হইলা সেক[১৯]
পুরন্দর হইলে মলনা[২০]।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলে বাজায় বাজনা॥
আপুনি চণ্ডিকা দেবি তিহু হৈল্যা হায়া বিবি[২১]
পদ্মাবতী হল্য বিবি নূর।[২২]
জতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে এক মন
প্রবেশ করিল জাজপুর॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড়[২৩] বোলে বোল।
ধরিআ ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল॥

১২। মহাঁমদ—মোহম্মদ; ১৩। পেকাম্বর—পয়গম্বর=ঈশ্বরের বার্ত্তাবহ; ১৪। আদম্ফ—আদম=আদি মানব; ১৫। গাজী=যোদ্ধা; ১৬। কাজি=বিচারক। ১৭। ফকির=সন্ন্যাসী; ১৮। ভেক=বেশ; ১৯। সেক—শেখ=সম্মানিত ব্যক্তি (এখানে ধর্ম্মগুরু); ২০। মলনা—মওলানা; ২১। হায়া বিবি=হাওয়া বিবি (Eve); ২২। বিবি নূর=বিবি ফাতেমা—হজরত মোহম্মদের কন্যা; ২৩। পাখড় পাখড়=পাকড়াও পাকড়াও।

—বসুমতী সংস্করণ

বৌদ্ধদের অথবা বৌদ্ধসমাজ থেকে সদ্য-হিন্দুসমাজে-আগতদের মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণে আনুকূল্য করেছিল যে সব কারণ, সে-সবের মধ্যে এই দুটির কথা ভাবা যেতে পারে :—বৌদ্ধদের মতোই এই নবাগত ধর্ম্ম মূলতঃ নিরাকারবাদী ও জাতিভেদহীন, আর বৌদ্ধদের অনুরূপ অলৌকিকতা-প্রীতি ও গুরুপূজা এই নবাগত ধর্ম্মে ছিল। বাংলার লোকদের প্রকৃতি যে পরিবর্ত্তন-লোলুপ, তার একটি প্রমাণ ইংরেজ আমলেও মিলেছে : খৃষ্টান ধর্ম্ম এদেশে ব্যাপ্ত হতে পারেনি সংস্কার-আন্দোলনের ফলে—হিন্দু আর মুসলমান দুই সমাজেই—কিন্তু বাংলায় ইয়োরোপের প্রভাব যত ব্যাপক ও গভীর, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আজো তত নয়।

অতীতের সমাজ

বাংলার মুসলমানের অতীত সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পারা গেছে তাতে বলা যায়, বহু উপাদানে এ সমাজ গঠিত। বৌদ্ধ ও হিন্দু উপাদান, অর্থাৎ আদিম বাঙালী উপাদান, তাতে প্রচুর নিঃসন্দেহ, কিন্তু আরবী, পার্শী ও পাঠান উপাদানও তাতে নগণ্য নয়। চট্টগ্রামের পথে বহু আরব যে বাংলায় আসে চট্টগ্রামের ভাষায় আরবী ভাষার প্রভাব তার এক বড় প্রমাণ। পারশিক যারা এদেশে এসেছিল তারা সংখ্যায় কম, সাধারণতঃ রাজকর্ম্মচারী। আর এসেছিল পাঠান—উচ্চ ও নীচ উভয় শ্রেণীর। পাঠান জমিদার-বংশ এখনো বাংলায় দুর্লভ নয়।

বাংলার মুসলমানের অতীত বলতে একটা দীর্ঘকালের ব্যাপার বোঝায়—মুসলমান এদেশে যখন থেকে এসেছে তখন থেকে ইংরেজ-শাসনের সূচনা পর্য্যন্ত, অর্থাৎ দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত। এই দীর্ঘকাল যে এদেশের মুসলমান-সমাজ একই অবস্থার ভিতর দিয়ে কাটায়নি তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তার সেই সামাজিক ইতিহাসের একটা পরিচ্ছন্ন রূপ আঁকবার মত সামর্থ্য আজো এদেশের ঐতিহাসিকদের লাভ হয়নি। শুধু এই কথাটা বলা যায় যে মুসলমানের প্রথম অবস্থার স্বাতন্ত্র্য ও বিজয়-দর্প কবিকঙ্কন-চণ্ডীতে যে ভাবে অঙ্কিত হয়েছে, পরে পরে তার সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটে। হিন্দু আর মুসলমান-সমাজের স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিহ্ন হয়নি কোনো দিন, কিন্তু উভয় সমাজের শ্রেষ্ঠ চিন্তা-ভাবনার ধারা যে কালে প্রায় একমুখী হয়ে পড়ে, বাউল-সাহিত্য ও মুসলমান-বৈষ্ণব-কবিদের রচনা তার প্রমাণ। মধ্যযুগে সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের এই ধরণের মিলনের মনোজ্ঞ বর্ণনা রয়েছে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' গ্রন্থে।

মধ্যযুগে হিন্দু-চিন্তাধারার সঙ্গে মুসলমানের চিন্তধারার এই ধরণের অভিন্নতা সাধারণতঃ একালের শিক্ষিত মুসলমানদের দুঃখ দেয়। তাঁদের ধারণা, এটি এদেশে মুসলমানের আত্মবিলোপের পরিচয়—ইসলামের সত্যকার আদর্শ যে কালে কালে এদেশের মুসলমানদের মধ্যে শিথিল হয়ে যায়, তার এক রূঢ় প্রমাণ। এই মতের জন্মকথাও আমাদের আলোচনার বিষয় হবে। কিন্তু

আপাততঃ বলা দরকার যে, এই ওহাবী-প্রভাবান্বিত মতকে সত্য বলে গ্রহণ করলে দীর্ঘ সুফী-সাধনাকে ইসলামের ইতিহাসে একটি উপদ্রব বলেই গণ্য করতে হয়—মুসলমান-সমাজ ব্যাপকভাবে আর অনেক চিন্তাশীল মুসলমান বিশেষভাবে আজো তেমন মনোভাব পোষণের বিরোধী।

একালের সূচনা বা ব্রিটিশ যুগ

যে কারণে বাংলার মুসলমানের সেকাল আর একাল বল্‌তে আমরা তার ব্রিটিশ-পূর্ব্ব আর ব্রিটিশ-পরবর্ত্তী অবস্থা বুঝতে চাচ্ছি তা সামান্য নয়। এই ব্রিটিশ-পরবর্ত্তী কালে এদেশের মুসলমানদের রাজ-নৈতিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থা যে ব্যাপক-ভাবে হীন হয়ে প'ড়েছে তা যথার্থ। এ সম্পর্কে আমাদের প্রধান আশ্রয়স্থল হাণ্টার সাহেবের সুবিখ্যাত কিন্তু অধুনা দুষ্প্রাপ্য Our Indian Mussalmans গ্রন্থ—১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। তাতে লেখকের অকুণ্ঠিত মত এই :—(১)

১৭০ বৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া অসম্ভব ছিল ; আজ ধনী থাকাই তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু এই রাজ-নৈতিক ও অর্থ-নৈতিক দুর্গতির চাইতেও বড় কারণ এই বিভাগের মূলে আছে। এই কালে মুসলমান-সমাজের চিন্তাধারায় যে সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটেছে সেটি বিশেষভাবে

(১) A hundred and seventy years ago it was almost impossible for a wellborn Mussalman in Bengal to become poor ; at present it is almost impossible for him to continue rich (P. 155).

লক্ষ্য করবার বিষয়। এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়েছে ওহাবী-আন্দোলনের ফলে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যা সমবয়সী, আর যার মূলেও রাজ-নৈতিক ও অর্থ-নৈতিক কারণ প্রবলভাবে বিদ্যমান। এই ব্রিটিশ-পরবর্ত্তী যুগকে মুসলমান-সমাজের জন্য ওহাবী-যুগও বলা যেতে পারে। কিন্তু ওহাবী-আন্দোলন ও তার বিচিত্র পরিণতি যখন এদেশে ব্রিটিশ-প্রভাবেই বিশেষ-ভাবে ঘটেছে, তখন এর প্রাক্-ব্রিটিশ আর ব্রিটিশ-পরবর্ত্তী নামকরণই বেশী সঙ্গত মনে হয়।

ওহাবী মতবাদ সম্বন্ধে গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য নয়। এর মূল ইসলামের ইতিহাসে গভীরভাবে প্রোথিত। কোরআনের কোনো উক্তি সম্বন্ধে "কেন?" এই প্রশ্ন করা চলবে না, কোরআনে যা আছে, যে ভাবে আছে, তাইই মানতে হবে, এই যে বিচার-বিরোধী মত, এটি অষ্টম শতাব্দীর ইমাম আবু হানিফার বিচার-বাদের মতোই সুপ্রাচীন। কিন্তু প্রথমে ইসলামের ইতিহাসে বিকাশের সুযোগ পায় বিচার-বাদ। একাদশ শতাব্দীর ইমাম গাজ্জালীর সময় থেকে বিচার-বাদ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় ও সুফী-বাদ মুসলমান সমাজে প্রাধান্য লাভ করে, এ কথা বলা যায়। সুফী-মত বহুমতের সমষ্টি। তবে সে-সবের একটি সাধারণ লক্ষণ এই যে, তাতে গুরুর আনুগত্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়। শাস্ত্রকেও সুফীরা মানেন, কিন্তু পীর বা গুরুকে বিশেষভাবে মানেন; সত্যের সত্যকার ভাণ্ডারী গুরু—এই তাঁদের বিশ্বাস, আর তাঁদের জীবনের প্রধান

উদ্দেশ্য—বিশ্বের যিনি বিধাতা তাঁর সঙ্গে প্রেমের যোগ বা পরমাত্মীয়তা স্থাপন করা। সুফী-মত মুসলমান-জগতে ও মুসলমান-সংশ্লিষ্ট-জগতে দীর্ঘকাল প্রভাব বিস্তার করে' চলে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সুফী-মতের এই গুরুবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উত্থাপন করেন ইমাম ইব্নে তায়মিয়া। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন কিন্তু সুফী-প্রাধান্য খর্ব্ব করতে পারেন না। সুফী-বাদের আনুষঙ্গিক গুরুপূজা তার অশেষ বৈচিত্র্য নিয়ে মুসলমান-জগতে ব্যাপকভাবে প্রভাব-শীল হয়ে চলে। এর বিরুদ্ধে আবার প্রবল আন্দোলন উত্থাপন করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরব-বীর আবদুল ওয়াহ্হাব। রাজনৈতিক বলও তাঁর লাভ হয়। তাঁর প্রচার মুসলমান-জগতে বিশেষভাবে কার্য্যকরী হয়েছে। তাঁরই পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রায়বেরেলি-নিবাসী শাহ্ সৈয়দ আহ্মদের প্রচারে ভারতে ওহাবী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে।

ওহাবী-মতকে সহজেই ধারণা করা যেতে পারে ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসে একটি বিশেষ ধর্ম্মমত বলে—হজরত মোহম্মদের দৈনন্দিন জীবনযাপন-পদ্ধতির একান্ত অনুসরণ যাতে অতি বড় ধর্ম্মাদর্শ জ্ঞান করা হয়। কিন্তু একালে এর আশ্চর্য্য প্রসারের মূলে যে শুধু ধর্ম্মব্যাকুলতা নয় বরং এর খুব বড় কারণ রাজনৈতিক, একথা না বুঝলে ওহাবী আন্দোলনের গুরুত্ব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধেই মুসলমান-জগতে ধ্বংসের

চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, অপর পক্ষে ইয়োরোপীয় জাতিদের শক্তি-বৃদ্ধি পায়। এই সঙ্কটে মুসলমান চিন্তাশীলদের মনে একথা প্রবলভাবে জাগা বিচিত্র নয় যে ইসলামের প্রতিশ্রুতি এই যে, তার অনুবর্ত্তীরা জগতে জয়ী হবে, কিন্তু আজ তারা পরাজিত হচ্ছে কেন? ওহাবী-চিন্তা-নায়করা এই উত্তর নিজেদের অন্তরে পান যে, ইসলাম তার প্রবর্ত্তকের হাতে যে-রূপ লাভ করেছিল তার সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটেছে—সেটি এক মহা অপরাধ।

আরবের ওহাবী-আন্দোলনকে বলা যায় মুখ্যতঃ ধর্ম্মান্দোলন—তার রাজনৈতিক রূপ অনেকখানি প্রচ্ছন্ন। কিন্তু ভারতের ওহাবী-আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপ অত্যন্ত অপ্রচ্ছন্ন। অষ্টাদশ শতাব্দী ভারতীয় মুসলমানের জন্য এক গভীর চেতনাহীনতার শতাব্দী. সৈয়দ গোলাম হোসেন যার রূপ তাঁর "সিয়ারুল্ মোতা'আখেরীন" গ্রন্থে নিপুণ হস্তে এঁকেছেন। এই চেতনা-হীনতার কালে একে একে ভারতীয় মুসলমানের রাজ্য গেল, ধনৈশ্বর্য্য গেল, সম্ভ্রম গেল, কিন্তু এত বড় সর্ব্বনাশ যে তার হলো সে-চেতনা তার জাগ্‌লো বহু দেরীতে—এমন সময়ে যখন কপালে করাঘাত করা ভিন্ন আর কিছু তার করবার নেই। কিন্তু এই অবস্থায়ও সে একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌তে প্রাণপণ চেষ্টা করলে—ভারতীয় ওহাবী আন্দোলনের তাই-ই প্রথম ও প্রধান পরিচয়। (অবশ্য তার পরবর্ত্তী পরিচয়ও কম অর্থপূর্ণ নয়।) ওহাবীদের প্রথমে যুদ্ধ বাধে শিখদের সঙ্গে, তারপরে দীর্ঘকাল ধরে তাদের অক্লান্ত অভিযান চলে ইংরেজের বিরুদ্ধে। শিখদের

বিরুদ্ধে জেহাদের ফতোয়া Our Indian Mussalmans গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে এই ভাবে :—(২)

শিখজাতি দীর্ঘদিন লাহোরে ও অন্যান্য জায়গায় প্রভুত্ব করে আসছে। তাদের উৎপীড়ন সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গেছে। শত সহস্র মুসলমানকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে, শত সহস্র মুসলমানের উপরে তারা অপমানের গুরুভার চাপিয়েছে। মসজিদে মসজিদে আজান আর হতে পারে না, গোহত্যা তারা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের এই অপমানকর অত্যাচার যখন একেবারে অসহনীয় হয়েছে তখন হজরত সৈয়দ আহ্‌মদ (তাঁর সৌভাগ্য সুচিরস্থায়ী হোক) কেবলমাত্র ধর্ম্ম রক্ষা হেতু কতিপয় মুসলমান সমভিব্যাহারে কাবুল ও পেশোয়ারের দিকে গমন করেন ও মুসলমানদের অনবধানতার নিদ্রা দূর করে তাদের অন্তরে কর্ম্মের সাহস সঞ্চার করেন। আল্লাহ্‌র মহিমা—তাঁর এই আহ্বানে কয়েক সহস্র ইমানদার আল্লাহ্‌র সেবার পথচারী হতে প্রস্তুত হন; আর কাফের শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ আরম্ভের তারিখ হচ্ছে ২১শে ডিসেম্বর, ১৮২৬ সাল।

(২) The Sikh nation has long held sway in Lahore and other places. Their oppressions have exceeded all bounds. Thousand of Muhammadans have they unjustly killed, and on thousands they have heaped disgrace. No longer do they allow the Call of Prayer from the mosques, and the killing of cows they have entirely prohibited. When at last their insulting tyranny could no more be endured, Hazrat Sayyid Ahmad (may his fortunes and blessings ever abide) having for his single object the protection of the Faith, took with him a few Mussalmans, and going in the direction of Kabul and Peshawar, succeeded in rousing Muhammadans from their slumber of indifference and nerving their courage for action. Praise be to God, some thousands of believers became ready at his call to tread the path of God's service; and on the 21st. December, 1826 the Jihad against the infidel Sikhs begins (I. 15),

ইংরেজের বিরুদ্ধে তাদের প্রচারের ধারাও উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে :—(৩)

যারা অপরকে জেহাদ অথবা হিজরত (দেশত্যাগ) থেকে নিরস্ত করতে চায় তারা মোনাফেক (ভণ্ড)। একথা সবাই জেনে রাখুক। যে দেশে মুসলমান ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম রাজশক্তির অধিকারী সেখানে মোহম্মদের ধর্ম্মনীতি প্রভাবশালী হতে পারে না। মুসলমানদের কর্ত্তব্য হচ্ছে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া ও কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। যারা যুদ্ধে যোগ দিতে অসমর্থ তাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে সত্যধর্ম্মশাসিত কোনো দেশে হিজরত করা। বর্ত্তমান কালে হিন্দুস্থানে সংগ্রাম একটি কঠোর কর্ত্তব্য। যে এ কথা অস্বীকার করে সে বলুক যে সে ভোগ-বিলাসের দাস। যে হিজরত করে ফিরে আসে সে জানুক যে তার সমস্ত অতীত ধর্ম্ম-কর্ম্ম বৃথা হয়েছে। যদি হিন্দুস্থানে তার মৃত্যু হয় তবে মুক্তির পথ তার মিলবে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়—ভাই সব, আমাদের অবস্থার জন্য আমাদের অশ্রুপাত করা উচিত, কেননা আল্লাহ্‌র নবী এই কাফেরিস্তানে বাসের জন্য আমাদের উপরে ক্রুদ্ধ। যখন আল্লাহ্‌র নবীই আমাদের উপর অসন্তুষ্ট তখন কার কাছে আমরা আশ্রয় পাব? আল্লাহ্ যাদের সঙ্গতি দিয়েছেন তাদের হিজরতের জন্য কৃত-সংকল্প হওয়া উচিত, কেননা এখানে আগুন লেগে গেছে। যদি আমরা সত্য কথা বলি তবে আমাদের মৃত্যু বরণ করতে হবে, আর যদি চুপ করে থাকি তবে আমাদের ধর্ম্মে আঘাত পড়ে।

(৩) Those who would deter others from Holy war or Flight are in heart hypocrites. Let all know this. In a Country where the ruling religion is other than Muhammadanism, the religious principles of Muhammad cannot be enforced. It is

এ থেকে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষ যে অমুসলমান রাজ্য (দারুল্ হর্ব্) হয়ে পড়েছে, অর্থাৎ মুসলমান-ধর্ম্মানুমোদিত শাসন এদেশে অসম্ভব হয়ে পড়েছে, এতেই ওহাবীদের যত বিক্ষোভ। তাই মনে হতে পারে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কারণই এই বিক্ষোভের মূলে। এক হিসাবে ব্যাপারটা তাই-ই। কিন্তু ধর্ম্ম এখানে প্রচলিত অর্থের ধর্ম্ম নয়, এখানে ধর্ম্মের বিশেষ অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার, হাণ্টার সাহেব তাঁর বইয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য এই :—মুসলমান শাস্ত্র মতে আমান-ই-আউয়াল যেখানে মুসলমানেরা ভোগ করতে পারে না সেটি অমুসলমান রাজ্য—দারুল্ হর্ব্। আমান-ই-আউয়াল এর অর্থ যাঁরা করেন ধর্ম্ম-চর্চ্চার অধিকার আর সেই বিবেচনা থেকে ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষকে দারুল্ ইসলাম (ইসলামী

---

incumbent on Muhammadans to join together, aud wage war upon the infidels. Those who are unable to take part in the fight should emigrate to a country of the True Faith. At the present time in India fight is a stern duty. He who denies this, let him declare himself a slave to sensuality. He who having gone away, returns again, let him know that all his past services are vain. Should he die in India, he will lose his away to salvation.—In short, Oh Brethren, we ought to weep over our state, for the messenger of God is angered with us because of our living in the land of the infidel. When the Prophet of God himself is displeased with us, to whom shall we look for shelter ? Those whom God has supplied with the means should resolve upon flight, for a fire is raging here. If we speak the truth, we shall be strangled ; and if we remain silent, injury is done to our faith (P. 70).

রাজ্য) বলেন, হাণ্টার সাহেবের মতে তাঁরা ভ্রান্ত। আমান-ই আউয়াল-এর অর্থ :—(৪)

মুসলমানেরা তাঁদের নিজেদের রাজত্বকালে যে নির্বিঘ্নতা ও ধর্ম্মগত অধিকার ভোগ করতেন তার সমগ্রতা।

মুসলমানের সেই সব অধিকার কেমন করে নিশ্চিহ্ন হলো যথেষ্ট সমবেদনার সঙ্গে হাণ্টার সাহেব তার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থ থেকে দীর্ঘ অংশের উদ্ধার আমাদের করতে হবে, কেননা বিষয়টি সাধারণতঃ অপরিজ্ঞাত এবং কৌতুকাবহ।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় মুসলমানের আশ্চর্য্য চেতনা-হীনতার কথা বলা হয়েছে। তাদের সেই চেতনাহীনতার সঙ্গে এদেশে ইংরেজের রাজ্য-বিস্তার এমন সন্তর্পণে নিষ্পন্ন হয়ে চল্‌লো যে, এত বড় একটা পরিবর্ত্তনের কথা দুই পক্ষেরই অজানা রইল দীর্ঘকাল ধরে। এ সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেবের উক্তি এই :—(৫)

ইংরেজরা বাংলাদেশ লাভ করেছিলেন দিল্লীর বাদশাহের প্রধান তহশিলদাররূপে মাত্র। মোটা ঘুষ না দিয়ে তলোয়ারের জোরে আমরা এই পদ পেয়েছিলাম। কিন্তু আইনতঃ আমরা লাভ করেছিলাম মাত্র দেওয়ানের পদ অথবা প্রধান-রাজস্ব-আদায়কারীর পদ। (মিঃ এইচি-সনের গ্রন্থে, অথবা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৮১২ সালের সংগৃহীত দলিলের ১৬ থেকে ২০ সংখ্যায়, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ আগষ্টের ফরমান

(৪) The whole security and full religious status which the Muhammadans formerly enjoyed under their own rule (p. 126).

(৫) The English obtained Bengal simply as the Chief Revenue officer of the Delhi Emperor. Instead of buying the appointment

দ্রষ্টব্য)। এজন্য মুসলমানেরা দাবি করেন যে মুসলমান শাসন-পদ্ধতি চালাবার ভার যে আমরা নিয়েছিলাম তা নিষ্ঠার সঙ্গে নিষ্পন্ন করতে আমরা আইনত বাধ্য ছিলাম। আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে এই সন্ধির সময়ে উভয় পক্ষের মনে এই কথাই ছিল। কিছুকাল পর্য্যন্ত ইংরেজরা মুসলমান কর্ম্মচারীদেরই তাঁদের বিভিন্ন পদে বহাল রেখেছিলেন। আর এর সংস্কারে যখন তাঁরা হাত দিতে আরম্ভ করলেন তখন অত্যন্ত সংযতভাবে এমনকি ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হলেন।

কিন্তু পরিবর্ত্তন যা ঘটবার তা কালে কালে ঘট্‌লো আর তার ফলও প্রত্যক্ষ হলো :—(৬)

প্রাচীন ব্যবস্থার মূলে সব চাইতে বড় আঘাত যা পড়ল তা একহিসাবে অলক্ষিত ভাবে কেননা ইংরেজ অথবা মুসলমান কেউই এর পরিণামের কথা ভাবেনি। সেই আঘাত হচ্ছে লর্ড কর্ণওয়ালিস ও সার

---

by a fat bribe we won it by the sword. But our legal title was simply that of the Dewan or Chief Revenue Officer. (See the Firman of the 12th August, 1765 in Mr. Aitchison's Treaties, or in the Quarto collection put forth by the East India Company in 1812. XVI to XX) As such the Muhammadans hold that, we were bound to carry out the Muhammadan system which we then undertook to administer. There can be little doubt, I think, that both parties to the treaty at the time understood this. For some years the English maintained the Muhammadan Officers in their posts; and when they began to venture upon reform, they did so with a caution bordering on timidity.

(৬) The greatest blow which we dealt to the old system was in one sense an underhand one, for neither the English nor the Muhammadans foresaw its effects. This was the series of changes introduced by Lord Cornwallis and Sir John Shore ending in the Permanent Settlement of 1793. By it we usurped the functions of

জন শোর প্রবর্ত্তিত সংস্কার-পরম্পরা যার পরিণতি হলো ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে। এই সংস্কারের ফলে আমরা অধিকার করলাম সেই সব উচ্চ মুসলমান-রাজপুরুষদের আসন যাঁরা রাজশক্তি ও প্রজার নিকট থেকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে রাজস্ব-সংগ্রহকারী এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী ছিলেন, আর যাঁদের নিযুক্ত কর্ম্মচারীদের হাতেই ছিল ভূমিকর আদায় সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থার ভার। ঢালী-ঘোড়সওয়ার-সমন্বিত মুসলমান তহশিলদারদের পরিবর্ত্তে আমরা জেলায় জেলায় স্থাপন করলাম এক একজন ইংরেজ কালেক্টার, তাঁর আদালতের সঙ্গে সংযুক্ত হলো ধর-পাকড়-নিলাম ইত্যাদির ক্ষমতাযুক্ত আমলাদের মতো অস্ত্রহীন বরকন্দাজ। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানেরা (এর ফলে) হয় ভূমিকরের সঙ্গে তাঁদের পূর্ব্বের সম্পর্ক হারালেন অথবা মাত্র ভূম্যধিকারী হলেন, ভূমিজাত লভ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি-বর্জ্জিত একটি সামান্য অংশ-মাত্রে রইল তাঁদের অধিকার।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই পরিবর্ত্তনের সূচনা হলো না বরং এর পরিণতি ঘটলো। আর-একভাবে বড় বড় মুসলমান ঘরের পক্ষে এটি বিষম ক্ষতির কারণ হলো—এই বন্দোবস্তের প্রবণতা হলো যেসব হিন্দু কর্ম্মচারী সাক্ষাৎভাবে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়-আদি করতেন তাঁদের জমিদার বলে স্বীকার করার দিকে। ১৭৮৮-৯০ সালের

those higher Mussalman officers who had formerly subsisted between the actual collector and the Government, and whose dragoons were the recognized machinery for enforcing Land-Tax. Instead of the Mussalman Revenue-Farmers with their troopers and spearmen, we placed an English collector in each District with an unarmed fiscal police attached like common bailiffs to his court. The Muhammadan nobility either lost their former connection with the Land-Tax or became mere land-holders with an inelastic title to a part of the profits of the soil.

ভূমি-বন্দোবস্তের হাতেলেখা রিপোর্ট আমি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি; ১৭৯৩ সালের আইন-সংগ্রহে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের কথা কিছু থাকলেও এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে সেই দিনের ভূমিকর-আদায়কারী কর্ম্মচারীদের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যবস্থার মাত্র তিনটি অঙ্গের দিকে দৃষ্টি ছিল—সরকার, প্রজার কাছ থেকে যিনি সাক্ষাৎভাবে খাজনা আদায় করতেন সেই স্থানীয় আমলা অথবা জমিদার, আর জমি যারা চাষ-আবাদ করতো সেই প্রজারা। আমাদের নূতন ব্যবস্থায় মাত্র এই তিনটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা

The Permanent Settlement, however, consummated rather than introduced this change. It was in another respect that it most seriously damaged the position of the great Muhammadan Houses. For the whole tendency of the settlement was to acknowledge as the land-lords the subordinate Hindu officers who dealt directly with the husbandmen. I have carefully gone over the Mss, Settlement Reports of 1788—1790 ; and notwithstanding the clauses touching intermediate holders in the code of 1793, it is clear to me that our Revenue officers of those days had an eye to only three links in the previous system—the state, the local agent or land-holder who collected direct from the peasantry, and the husbandmen who tilled the soil. These were the three features of the former administration requisite to our new plan, and by degrees all the other links of the Muhammadan Revenue system were either extruded or allowed to drop out. For example the provision respecting the separation of Independent Talukdars was in itself fatal to the greatness of many a Muhammadan House. Such a family, although it might grant away part of its territory in permanent farms, always exercised a sort of jurisdiction over its subordinate holders and when occasion demanded, managed to extreat cesses or benevolences, in short money in one form or other, from them. The officer (Mr. James O'Kinealy, C. S.) who has studied the Permanent Settlement most intimately in

প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়েছিল ; এ ভিন্ন মুসলমান আমলের ভূমিকর আদায় সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থা হয় বাদ দেওয়া হয়েছিল না হয় আস্তে আস্তে বাদ পড়ে গিয়েছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই ব্যাপারটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্বাতন্ত্র্যভোগী তালুকদারদের বিষয়-বণ্টন সম্পর্কে বিধি অনেক বড় বড় মুসলমান ঘরের জন্য সমূহ বিপত্তির কারণ হলো ; পূর্ব্বের নিয়ম অনুসারে এই সমস্ত ঘর তাঁদের তালুকদারির বিভিন্ন অংশ চিরস্থায়ীভাবে পত্তন দিলেও পত্তনীদারদের উপরে তাঁদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হতো না ; প্রয়োজন হলে সেস বা চাঁদা অর্থাৎ কোনো না কোনো রকমে অর্থ তাঁদের কাছ থেকে তাঁরা আদায় করতে পারতেন। বর্ত্তমান মুসলিম অসন্তোষ (ওহাবী বিদ্রোহ) সম্পর্কে যিনি (মিঃ জেম্‌স্ ও' কিনিলি, সি, এস্) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষ যত্ন সহকারে অনুধাবন করেছেন তিনি লিখেছেন—এর ফলে যে সমস্ত হিন্দু ভূমিকর-আদায়কারী এতদিন নগণ্য পদের অধিকারী ছিলেন তাঁরা হলেন জমিদার, জমির মালিকানা স্বত্ব তাঁদের হলো, আর মুসলমান আমলে যেসব টাকা মুসলমানদের ঘরে যেত তা গেল তাঁদের ঘরে।

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল মুসলমানদের আর্থিক অবস্থার উপরে যা হলো তার চাইতেও গুরুতর হলো Resumption Proceedings—নিষ্কর বাজেয়াপ্তের ব্যাপার—সে সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেবের বক্তব্য এই :—ইংরেজ বাংলার রাজা হয়ে যখন জমির অবস্থার খোঁজ নিলে তখন দেখ্‌লে, দেশের প্রায়

---

connection with the present Muhammadan disaffection (Wahhabi Rebellion) writes thus :—It elevated the Hindu collectors, who upto that time had held but unimportant posts, to the position of land-holders, gave them a proprietory right in the soil, and allowed them to accumulate wealth which would have gone to the Mussalmans under their own Rule.

চার ভাগের এক ভাগ জমি নিষ্কর-ভোগীদের করায়ত্ত। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ এটি বুঝলেন। কিন্তু—(৭)

এই ধরণের জমিজমা বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে তখন জনমত এত প্রবল ছিল যে কাজে কিছু হয়ে উঠ্‌লো না। ১৭৯৭ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস ব্যাপকভাবে ও জোরালোভাবে ঘোষণা করলেন যে বর্ত্তমান সরকারের অননুমোদিত নিষ্করসমূহে সরকারের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব বর্ত্তমান। কিন্তু সেদিনের অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজশক্তিও এই নীতি কার্য্যে পরিণত করতে সাহসী হলেন না। এক-চতুর্থ শতাব্দী কাল এই ভাবেই কাট্‌লো। তারপর ১৮১৯ সালে সরকার আবার তাঁদের এই অধিকারের কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু এবারও কার্য্যে অগ্রসর হলেন না। অবশেষে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক-শক্তি ও শাসন-শক্তি একযোগে এক বড় চেষ্টা করলেন। বিশেষ-ক্ষমতাসমন্বিত আদালতের সৃষ্টি হলো, আর তার পরের আঠারো বৎসর ধরে সমস্ত বঙ্গ প্রদেশে চললো সন্ধানী, মিথ্যাসাক্ষী, আর অটল ও মমতাহীন বাজেয়াপ্তকারী রাজপুরুষদের রাজত্ব। এই নিষ্কর বাজেয়াপ্তে আট লক্ষ পাউণ্ড খরচ করে বার্ষিক তিন লক্ষ পাউণ্ডের স্থায়ী আয় সরকারের লাভ হলো, অর্থাৎ ষাট লক্ষ পাউণ্ড বার্ষিক শতকরা পাঁচ পাউণ্ড সুদে খাটলে যত আয় হতো তত

---

(৭) The feeling against resuming such tenures was then too strong to allow of any active steps being taken. In 1793 Lord Cornwallis again asserted in the strongest and broadest manner the inalienable right of Goverment to the rent-free grants which had not obtained the sanction of the Ruling Power. But even the stronger Government of that day did not venture to carry out this principle. The subject rested for another quarter of a century until 1819, when the Government again asserted its rights, but again shrank from enforcing them. It was not until 1828 that the Legislature

আয়। এই অর্থের মোটা অংশ পাওয়া গিয়েছিল মুসলমান পরিবারের, অথবা মুসলমান প্রতিষ্ঠানের বাজেয়াপ্ত নিষ্কর থেকে। এর ফলে যে ভীতি ও বিতৃষ্ণার সঞ্চার হয়েছিল, পল্লীর উপর তার ছাপ চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হয়ে গেছে। শত শত প্রাচীন পরিবার এর ফলে বিনষ্ট হলো, আর, মুসলমানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রায় সবই নিষ্করের আয়ে চল্‌তো, এর ফলে সে-সব মৃত্যুদণ্ড লাভ করলো।…মুসলমান প্রতিষ্ঠানগুলোরই খুব বেশী ক্ষতি হলো কেননা অন্যান্য ব্যাপারের মতো এই সব নিষ্কর স্বত্বের তায়দাদ রক্ষা ব্যাপারেও এক সময়ের এই ভারত-বিজেতারা গর্ব্বিত ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়েছিলেন, সঞ্চয়ী ও সূক্ষ্মবুদ্ধি হিন্দুর মনে সে-ভাব ঠাঁই পায়নি। (নিষ্কর বাজেয়াপ্ত প্রথম অবস্থায়ই নিদারুণ হয়ে উঠেছিল, তারপর সাত বৎসর কাল মন্থর ভাবে এ চলে। অবশেষে ১৮৪৬ সালের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখের সরকারি ইস্তাহারে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।)

---

and the Executive combined to make one great effort. Special Courts were created, and during the next eighteen years tne whole Province was over-run with informers, false witnesses, and calm stern Resumption officers. At an outlay of £ 800000 upon Resumption proceedings an additional revenue of £ 300000 a year was permanently gained by the state representing a capital of five percent of six millions sterlings. A large part of this sum was derived from lands held rent-free by Mussalmans or Muhammadan foundations. The panic and hatred which ensued have stamped themselves for ever on rural records. Hundreds of ancient families were ruined, and the educational system of the Mussalmans, which was almost entirely maintained by rent-free grants, received its deathblow...... Muhammadan foundations suffered most; for with regard to their title-deeds, as with regard to all other matters, the former conquerors of India had displayed a haughty indifference unknown to the provident and astute Hindu. (The Resumption proceedings were fierecest at the beginning, and after languishing for seven

নিষ্কর যাঁরা ভোগ করতেন তাঁদের অনেকেরই ন্যায়-সঙ্গত অধিকার ছিল না, হাণ্টার সাহেব এই মত দিয়েছেন, তবু তিনি বলেছেন—(৮)

মাঝে মাঝে প্রতিবাদ জানিয়েও ৭৫ বৎসর ধরে আমরা এক প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজী সহ্য করে আসছিলাম ; আর সেই দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত শাস্তি গিয়ে পড়লো এক-পুরুষের উপরে।

নিষ্কর বাজেয়াপ্ত যে যুগে চলে সেই যুগেই আদালতের ভাষা পার্শীর পরিবর্ত্তে ইংরেজী হয়। মুসলমানরা যে দুটি কারণে ইংরেজী শিখতে এগুলো না তার প্রথমটি ধর্ম্মনাশ ভয়—এ সময়ে দেশে খৃষ্টান করবার ও হবার হিড়িক পড়ে যায়—কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি প্রথম কারণের চাইতে অনেক বড়, সেটি—নব রাজশক্তির প্রতি মুসলমানের বিরূপতা দীর্ঘ ওহাবী-বিদ্রোহের ভিতরে রয়েছে যার সুস্পষ্ট পরিচয়। ওহাবী-বিদ্রোহকে যে শাসকরা ব্যাপকভাবে ভারতীয় মুসলমানের বিদ্রোহ জ্ঞান করেছিলেন হাণ্টার সাহেবের বইয়ের নামকরণ তার এক প্রমাণ—তাঁর বইয়ের পুরো নাম হচ্ছে—Our Indian Musalmans : are they bound to owe allegiance to the Queen? "আমাদের ভারতীয় প্রজা—মহারাণীর আনুগত্য স্বীকারে তারা কি বাধ্য ?"—এই বিদ্রোহ বাংলার মুসলমান-পল্লীসমাজে পর্য্যন্ত কিরূপ ব্যাপক

---

years were officially terminated by the Government order of March 4, 1846)

(৮) During seventyfive years we had submitted under protest to a gigantic system of fraud, and the accumulated penalty fell upon a single generation (p. 183).

হয়েছিল সে সম্পর্কে হাণ্টার সাহেবের এই বিবৃতিটি কৌতুকাবহ:—(৯)

পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় প্রত্যেক জেলা থেকে ওহাবী প্রচারকেরা সাধারণতঃ বিশ বৎসরের কম বয়সের শত শত সরলমতি যুবককে, অনেক সময়ে তাদের পিতামাতার অজ্ঞাতে, নিশ্চিতপ্রায় মৃত্যুর পথে সঁপে দিয়েছে। শত সহস্র কৃষক পরিবারে তারা দারিদ্র্য ও শোক প্রবিষ্ট করিয়েছে, আর আশা-ভরসা-স্থল যুবকদের সম্বন্ধে পরিজনের অন্তরে একটা স্থায়ী দুর্ভাবনা এনে দিয়েছে। যে ওহাবী পিতার বিশেষ-গুণবান অথবা বিশেষ-ধর্ম্মপ্রবণ পুত্র বিদ্যমান তিনি জানেন না কোন্ সময়ে তাঁর পুত্র গ্রাম থেকে উধাও হয়ে যাবে। এই ভাবে যেসব যুবককে উধাও করা হয়েছে তাদের অনেকেই ব্যাধি, অনাহার অথবা তরবারির আঘাতে বিনষ্ট হয়েছে।

এটিকে কৌতুকাবহ বলেছি এর সঙ্গে এ কালের হিন্দুসমাজের সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্যকলাপের আশ্চর্য্য মিল দেখে। বাংলার লোকদের প্রকৃতি যে পরিবর্ত্তনলোলুপ, নূতনত্বের মোহ তাদের জন্য যে দুর্নিবার তা সে নূতনত্ব যত বিপদসঙ্কুলই হোক, তারও সমর্থন রয়েছে এর মধ্যে।

(৯) The Wahhabi preachers have drafted away to almost certain slaughter hundreds of deluded youths, generally under twenty, and often without the consent of their parents, from nearly every district of Eastern Bengal. They have introduced misery and bereavement into thousands of peasant families and created a feeling of chronic anxiety throughout the whole rural population with regard to their most promising young men. No Wahhabi father who has a boy of more than usual parts or piety, can tell the moment at which his son may not suddenly disappear from the hamlet. Of the youths thus spirited away by far the

ওহাবীদের এই বিরূপতা সমগ্র মুসলমান সমাজের প্রতি শাসকদের মনকে সহজেই বিরূপ করে' তুল্‌লো আর তার অপরিহার্য্য ফল দাঁড়ালো—দেশের শাসনকার্য্যের সঙ্গে মুসলমানদের অদ্ভুত বিচ্ছেদ দীর্ঘ দিন যাতে পরিবর্ত্তন ঘট্‌লো না। এ সম্পর্কে Our Indian Mussalmans গ্রন্থে উদ্ধৃত ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাইয়ের "দূরবীণ" নামক পার্শীভাষায় লিখিত সংবাদ-পত্রের এই অভিযোগ অর্থপূর্ণ :—(১০)

বড় ছোট সমস্ত রকমের চাকরী মুসলমানদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য জাতীয় লোকদের, বিশেষ করে হিন্দুদের, দেওয়া হচ্ছে। সরকার বাহাদুরের কর্ত্তব্য হচ্ছে সর্ব্ব শ্রেণীর প্রজার উপরে সমদৃষ্টি হওয়া, কিন্তু এখন এমন কাল এসেছে যখন সরকারি চাকরী থেকে মুসলমানদের বাদ দেওয়ার কথা প্রকাশ্য ভাবে গেজেটে লেখা হয়। সম্প্রতি সুন্দরবন কমিশনারের আপিসে কতকগুলি চাকরী খালি হলে উক্ত রাজ-কর্ম্মচারী সরকারী গেজেটে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দেন যে এই সব পদ হিন্দু ভিন্ন আর কাউকে দেওয়া হবে না। মোটের উপর মুসলমানদের এখন এমন দুর্গতি হয়েছে যে সরকারি চাকরির যোগ্যতা তাদের লাভ হলেও সরকারি ইস্তাহার সহযোগে ইচ্ছা করে তাদের দূরে রাখা হয়। কেউ তাদের অসহায় অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করে না, তারা যে আছে এই কথাটাও উচ্চতর রাজকর্ম্মচারীদের মনে স্থান পায় না।

---

greater portion perished by pestilence, famine and the sword (p. 110)

(১০) All sorts of employments great and small, are being gradually snatched away from the Muhammadans and bestowed on men of other races, particularly the Hindus. The Government is bound

এর উপরে হাণ্টার সাহেব এই মন্তব্য করেছেন—(১১)

এই পারশ্য-ভাষাভাষী সাংবাদিকের উক্তির যাথার্থ্য নিরূপণ করবার মতো দলিলাদি এখন আমার হাতে নেই, কিন্তু সেই সময়ে এই উক্তির প্রতি কিছু মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল, আর এর প্রতিবাদের কথা আমি শুনি নাই।

শাসক-শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় হাণ্টার সাহেব বিদ্রোহী মুসলমানদের কথা যে এতখানি সমবেদনার সঙ্গে ভাবতে পেরেছেন সেজন্যে তিনি প্রশংসার্হ ও শ্রদ্ধার্হ। কিন্তু তাঁর মূল দৃষ্টি-কোণে যে গলদ আছে সে কথাও ভাবতে হবে। তিনি ভারতীয় মুসলমানের সমস্যার দিকে তাকিয়েছেন শাসকের দৃষ্টিতে—শাসক-শ্রেণীর তরফ থেকে অনুগ্রহ বিতরণ যথাসম্ভব ন্যায়-ধর্ম্মানুমোদিত হোক এই তাঁর বক্তব্য। মুসলমানেরা তাদের

to look upon all classes of its subjects with an equaleye, yet the time has now come when it publicly singles out the Muhammadans in its gazettes for exclusion from official posts. Recently when several vacancies occurred in the office of the Sundarbans Commissioner, that official, in advertising them in Government gazette, stated that the appointments should be given to none but Hindus. In short the Mahammadans have now sunk so low, that even when qualified for Government employ, they are studiously kept out of it by Government notifications. Nobody takes any notice of their helpless condition and the higher authorities do not deign even to acknowledge their existence.

(১১) I have not at present the means of officially tracing and verifying this statement of the Persian journalist, but it attracted some notice at the time, and was not, so far as I heard, contradicted (p. 172).

শাসনকালে যে সমস্ত সুখ সুবিধা ভোগ করতো তা যে পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত ছিল না সে সম্বন্ধেও অকুণ্ঠিত তাঁর মতামত—(১২)

প্রকৃত ব্যাপার এই যে মুসলমান আমলে রাজ্য-শাসন ছিল বহুকে রক্ষা করবার জন্যে নয় বরং মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে সমৃদ্ধ করবার যন্ত্র। প্রত্যেক জেলায় অল্প কয়েকটি পরিবার আনন্দে বিলাসে দিন কাটাবে এ জন্য অগণিত চাষীকে যে গ্রীষ্মের খররৌদ্র ও বর্ষার বারিধারা নগ্ন পৃষ্ঠে সহ্য করে পরিশ্রম করতে হয়, মনে হয়, একথাটি শাসকদের হৃদয়কে কখনো স্পর্শ করেনি অথবা তাঁদের বিবেককে বিচলিত করেনি। দেশের দশজনের অস্তিত্ব তখনই স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো যখন আমরা প্রাচীন ব্যবস্থা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে আরম্ভ করলাম যদিও ন্যায়ত সেই প্রাচীন ব্যবস্থার রক্ষার ভারই আমাদের উপরে পড়েছিল। মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর অধিকারের সীমা যে আমরা নির্দ্দেশ করলাম এই হলো তাঁদের প্রতি আমাদের সব চাইতে বড় অন্যায়।

মুসলমান-শাসনের এমন অধোগতি মুসলমান-শাসনের অন্তিম দশায়ই ঘটেছিল—সুবিখ্যাত সিয়ারুল্‌ মোতা' আখেরীন-এর

(১২) The truth is that under the Muhammadans Government was an engine for enriching the few, not protecting the many. It never seems to have touched the hearts or moved the consciences of the rulers, that a vast population of husbandmen was toiling bare-backed in the heat of summer and in the rain of autumn, in order that a few families in each district might lead lives of luxurious ease. It is only after we had begun to break away from the system which we had virtually engaged to uphold that the existence of the people discloses itself. The greatest wrong which we did to the Mussalman aristrocracy was in defining their rights.

লেখকও এই মত ব্যক্ত করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন যে, মুসলমান শাসনের গৌরবের দিনে দীনতম প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অধিকার সম্বন্ধেও বাদশা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানের অতীত যাই-ই হোক একালে সে ভারতবাসী ভিন্ন আর কিছুই নয়—অর্থাৎ ভারতবর্ষ একটি দেশ আর ভারতবাসী একটি জাতি, ভারতবর্ষের অন্যান্য বহু ধর্ম্মাবলম্বীর মতো মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বীদের কথাও সেই দেশ ও জাতির শ্রীবৃদ্ধির দিক থেকেই ভাবতে হবে, সম্প্রদায় হিসাবে বিশেষ অনুগ্রহ বা বিশেষ নিগ্রহের ভাবনা তার জন্য অসত্য, সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত অনিষ্টকর—এই গোড়ার কথাটা হাণ্টার সাহেবের ভাবনার বিষয় হয় নাই।

ওহাবী-বিদ্রোহের পরে

ওহাবীদের দমন করতে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের লোকবল ও অর্থবল দুইয়েরই অপচয় হয়েছিল। পরিশেষে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বহু ওহাবীকে নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে শাসকবর্গ কিঞ্চিৎ স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। সিপাহী-বিদ্রোহ দমন ও ওহাবী-বিদ্রোহ দমন এই দুইয়ের প্রভাবে মুসলমান-সম্প্রদায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়লো, অথবা তাদের দুর্ব্বলতা অত্যন্ত প্রকট হলো, এবং শাসকবর্গের কৃপাভিক্ষা ভিন্ন তাদের গত্যন্তর রইল না। বিফল বিদ্রোহের এমন বিনতি স্বাভাবিক সন্দেহ নেই, কিন্তু বড় করুণ।

এই দুর্দ্দিনে তাদের চল্‌লো ধর্ম্ম সম্বন্ধে নূতন চিন্তা। ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে অমুসলমান রাজ্য "দারুল্‌ হর্‌ব্‌" নয়, কেননা

মুসলমানের দৈনন্দিন ধর্ম্মকর্ম্মে এদেশের শাসকবর্গ বাধা দেন না—এই মতের প্রসার-লাভের দিন এলো। এই সম্পর্কে নবাব আবদুল লতিফ খান বাহাদুরের নেতৃত্ব স্মরণীয়, আর স্মরণীয় এই সিদ্ধান্তের উপরে হাণ্টার সাহেবের কটাক্ষ—(১৩)

এই সিদ্ধান্ত অবস্থাপন্ন মুসলমানদের মনঃপূত হলো কেননা সীমান্তের যুদ্ধরত ধর্ম্মোন্মত্ত ছাউনিতে চাঁদা পাঠানোর বিপত্তি থেকে এতে তাঁরা রক্ষা পেলেন, আর আমাদেরও সন্তোষ বিধান করলে, কেননা বোঝা গেল, ধর্ম্মবিধি আর ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক উভয়েরই সদ্‌ব্যবহার যেমন হতে পারে বিদ্রোহের পক্ষে তেম্‌নি হতে পারে বশ্যতারও পক্ষে।

আস্তে আস্তে মুসলমানের নূতন মানসিকতা পরিচ্ছন্ন রূপ গ্রহণ করলো। ওহাবীর অকৃত্রিম কিন্তু অদ্ভুত (অদ্ভুত এইজন্য যে বিপক্ষের বলবীর্য্য সম্বন্ধে যোগ্য চেতনা দীর্ঘকালেও তাদের মনে জাগেনি) বিরোধিতা অতীতের সামগ্রী হলো, সর্ব্বসাধারণ মুসলমানের প্রধান অবলম্বন হলো প্রাত্যহিক জীবনে পালনীয় নিরুপদ্রব ধর্ম্মাচার। যেমন মধ্যযুগে মুসলমান-বিজয়ের প্রভাবে হিন্দু-সমাজে দেখা দিয়েছিল পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধের অভাব ও ধর্ম্মাচারের আধিক্য, তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ-বিজয়ের প্রভাবে মুসলমান-সমাজে দেখা দিল নৈরাশ্য ও

---

(১৩) The result (decision) must be accepted as alike satisfactory to the well-to-do Mussalmans whom it saves from the perils of contributing to the Fanatic Camp on our Frontier, and gartifying to ourselves as proving that Law and Prophets can be utilized on the side of loyalty as well as the side of sedition (p. 120).

মাত্রাতিরিক্ত ধর্ম্মাচারপ্রীতি—এ কথা বোঝা কঠিন নয় কিন্তু বোঝানো কঠিন।

অতি-আধুনিক কালের কথা

সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে দিশাহারা ভাব আর পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে মাত্রাতিরিক্ত উৎকণ্ঠা, এইই একাল পর্য্যন্ত ব্যাপকভাবে ভারতীয় মুসলিম জীবনের পরিচায়ক বলা যেতে পারে। কিন্তু মুসলমান-সমাজও জগতের বৃহত্তর মানবসমাজের অন্তর্গত, সেই বৃহত্তর মানবসমাজে একালে যেসব চিন্তা-ভাবনা প্রকট হয়েছে, যেমন, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, মানুষের জাগতিক জীবনের সাফল্য, অবনত ও পদানত জাতিদের অভ্যুত্থান, জগতের বঞ্চিতদের অভিযান, সে-সব তাদেরও মর্ম্মদ্বারে ঘা না দিয়ে ছাড়ছে না। তাতে এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ ফল লাভ হয়নি, তবে অতি-আধুনিক কালে তা এক বিশেষ রূপ নিয়েছে মুসলমানের মনে : মুসলমানও আর নিষ্ক্রিয় থাক্‌বে না—এই বোধ তার অন্তরে জেগেছে, আর তার প্রবল ধারণা জন্মেছে যে, তার সমস্ত রকমের দুর্গতির জন্যে প্রধানতঃ দায়ী তার সব সময়ের সঙ্গী হিন্দু।

মুসলমানের এমন ধারণা অদ্ভুত নিঃসন্দেহ, কিন্তু অর্থশূন্য নয়। তার এ রকম ধারণার মূলে যাঁরা দেখেন মাত্র শাসকশ্রেণীর Divide and Rule (ভেদ) নীতির ক্রিয়া তাঁদের মতকে বেশী মূল্য দেওয়া যায় না। ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনায় যখন মুসলমানের

ভূসম্পত্তি নষ্ট হলো ও তা প্রধানতঃ হিন্দুর করায়ত্ত হলো সেটি যে কোনো স্পষ্ট শাসন-নীতির ফলে হয়েছিল তা নয়। এ সম্পর্কে হাণ্টার সাহেবের উক্তি স্মরণীয়—The greatest blow which we dealt to the old system was in one sense an underhand one, for neither the English nor the Muhammadans foresaw its effects.(১৪) তারপর ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মুসলমানের দীর্ঘকালব্যাপী বিরূপতা আর হিন্দুর অনুরাগ যে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি স্পষ্ট বিরোধিতার জন্য সম্ভবপর হলো তা নয়, শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে-ব্যবধান মুসলমান আমলে ছিল তাইই দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ রইল মাত্র। এই বিদ্রোহী মুসলমানদল দীর্ঘ দিন বিদ্রোহী থেকে শেষে হলো বিপর্য্যস্ত, কিন্তু অনুগ্রহকামী হিন্দুর দলে কালে জন্মালো নব-মানবতার বাণীবাহক একটি ক্ষুদ্র দলও। এই ক্ষুদ্র সৃষ্টিধর্ম্মী দলের কাছ থেকেই দেশ কালে কালে পেলো তার রাজনৈতিক জাগরণ—বহু ত্রুটি সত্ত্বেও যার অকৃত্রিমতায় জগতের সন্দেহ নেই। কিন্তু নিগৃহীত মুসলমান অনুগৃহীত হিন্দুর এহেন পরিবর্ত্তন-সম্ভাবনার প্রতি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ভিন্ন তাকাতে পারছে না, বিশেষতঃ সেই হিন্দুর সমাজজীবনে অস্পৃশ্যতা, কঠোর জাতিভেদ, প্রভৃতি তুচ্ছতার প্রভাব আজো যখন অপ্রবল নয়।—অতি-আধুনিক

(১৪) প্রাচীন ব্যবস্থার মূলে সব চাইতে বড় আঘাত যা পড়লো তা একহিসাবে অলক্ষিতভাবে কেননা ইংরেজ অথবা মুসলমান কেউই তখন এর পরিণতির কথা ভাবেনি।

কালের এই বিবর্দ্ধিত হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের দিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে অভিভূত না হয়ে আশ্বস্তও হওয়া যায়। বৃহত্তর জগতের ঘটনা ও চিন্তা-প্রবাহে যখন ভারতীয় জীবনে চেতনার সঞ্চার হয়েছে তখন সেই উদার স্রোতই সংশোধিত করে চল্‌বে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের বিচিত্র বিকৃতি। এর সঙ্গে মুসলমান-জগতে মুস্তফা কামালের আবির্ভাবের কথাও স্মরণীয়। ওহাবীদের আদিম-ইসলামে-প্রত্যাবর্ত্তন-বাদ আজো যত প্রবলই হোক কামালের বিজ্ঞান-বাদ ও জাতীয়তা-বাদের অপূর্ব্ব সাফল্য যে তার যোগ্য প্রভাব বিস্তারে অপারগ হবে না, এ আশা করা যায়।

১৩৪৪

পরিবেষ্টনের সঙ্গে প্রেমের যোগ

বন্ধুগণ, আপনাদের প্রীতির জন্য আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। অন্যান্য স্বাভাবিক মানুষের মতো প্রীতি আমারও কাছে বহুমূল্য।

"পূরবী" সাহিত্য-সম্মেলনে কি কথা বলতে হবে সে কথা ভাবতে গিয়ে প্রথমেই আমার চোখ পড়েছে দেশের বিক্ষুব্ধ অবস্থার উপরে, যে অবস্থা সাহিত্য-চর্চ্চার অনুকূল নয়। সাহিত্যকে বলা যায় সৌন্দর্য্যময় জ্ঞান; কিন্তু যেখানে বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলা রাজত্ব বিস্তার করে বসেছে সেখানে একান্ত অভাব হয়েছে জ্ঞানাভিসারী কৌতূহলের ও সৌন্দর্য্যাভিসারী মাত্রাবোধের, সেখানে মৌনাবলম্বনই সাহিত্যিকদের জন্য প্রশস্ত—দুর্য্যোগে যেমন আচ্ছন্ন হয় সূর্য্য-রশ্মির প্রসন্নতা। পূরবী সাহিত্য-সম্মেলনকে আমি তাই জ্ঞান করেছি একটি বিশিষ্ট বন্ধু-সম্মেলন বলে। বন্ধুদের নিয়ে উৎসব করবার কথা কবি-শেখর হাফিজ বলে গেছেন; সে-উৎসব সুদিনে ত জমেই, দুর্য্যোগে দুর্দ্দিনেও তা জমে—হয়ত আরো নিবিড় ভাবে।

আমার এই মন্তব্যে আপত্তির অবকাশ আছে, জানি। কেউ কেউ হয়ত বলবেন, দেশ বলতে যে বিরাট ব্যাপার বোঝায় সৃষ্টি-প্রক্রিয়া তার সর্ব্বত্র চলে না, তা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সৃষ্টিই বল আর সাহিত্যিক সৃষ্টিই বল; সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে চলে বিভিন্ন

আয়তনে বিভিন্ন শ্রেণীতে বা গোষ্ঠীতে—ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে সৃষ্টি যেমন চলেছিল দেশের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ে। কথাটি ভাববার মতো। এও দেখা যাচ্ছে, যাকে আমরা বলছি দুর্য্যোগ দুর্দ্দিন সেদিনের কালোমেঘও একান্তভাবে রূপালী-ঝালর-বিহীন নয় —এই দিনে বাংলার মুমূর্ষু কৃষক নবজীবনের স্বপ্ন দেখবার অবকাশ পেয়েছে। কিন্তু তবু সাহিত্যের আসরে দাঁড়িয়ে দেশের বর্ত্তমান অবস্থাকে দুর্য্যোগ দুর্দ্দিন ভিন্ন আর কোনো আখ্যায় অভিহিত করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, কেননা, সাহিত্যের সৃষ্টি যাঁদের দ্বারা হয় তাঁরা বিশেষভাবে গোষ্ঠীর বা শ্রেণীর লোক হলেও যে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে তাঁহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস চলে তাতে বিরাজ করবে প্রসন্নতা এই-ই সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য বিধান—বিষবাষ্পে তা ভারাক্রান্ত হলে সাহিত্য-স্রষ্টার প্রাণপুরুষ হয়ে পড়ে নির্বীর্য্য। কবি হুইটম্যান বলেছেন বটে—What writest thou! there is only one subject—the subject of War (কি লিখ্‌চ! লেখার বিষয় ত মাত্র একটি—তার নাম সংগ্রাম); কিন্তু সাহিত্যের যুদ্ধকে বলা যেতে পারে ধর্ম্ম-যুদ্ধ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের চির-অক্লান্ত যুদ্ধ—মিলটন ও শেলী যা করেছেন। যে যুদ্ধে সে সুর বাজে না, তার পরিবর্ত্তে বাজে ক্ষুদ্র-লোভ ও ক্ষুদ্র লাভ-চিন্তার উৎকট সুর, তা যে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা যোগাতে অক্ষম এ কথা যথার্থ। এহেন যুদ্ধও অবশ্য জগতে বিরল নয়, আর এর স্তুতি-পাঠকের অভাবও কোনো কালে ঘটেনি। সাহিত্যের আসরও তাঁরা মাঝে মাঝে জবর-দখল করেছেন,

—কিন্তু কে না জানে যে আতস-বাজীর তীব্র রোশনায়ে আকাশের প্রশান্তি ও নক্ষত্রের শাশ্বত জ্যোতি যে আচ্ছন্ন হয় সে ক্ষণকালের জন্যই।—অতএব প্রয়োজন এই সমসাময়িক অস্বস্তিকে কিঞ্চিৎ ভোলা, অন্ততঃ এতে বিচলিত না হওয়া। সাহিত্যিকদের সভায় এটি সম্পূর্ণ সম্ভবপর। তাঁরাও দেশ-কালের সন্তান, নিঃসন্দেহ, কিন্তু সেই দেশ ও কাল চিরদিনই বিরাটতর। সেই বিরাটতর—সুতরাং নিভৃততর—আয়তনে আজ জমুক আমাদের মজলিস।

বরেণ্যবৃন্দ, আপনাদের সামনে আজ আমার বিশেষ নতুন কথা বলবার নেই, প্রয়োজনও হয়ত নেই, তবে প্রাচীন কথা স্মরণ করবার আছে। পুরাতন সত্য বার বার নতুন করে স্মরণ করতে হয়। সাহিত্যের যে সংজ্ঞাই দেওয়া যাক এর মূল কথা যে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব ও ভাষায় তার সুপ্রকাশ এ বিষয়ে সাহিত্যিকরা বোধ হয় একমত। সাহিত্য এক শ্রেণীর শিল্প, তাই সাহিত্য প্রসঙ্গে সহজেই শিল্প-চাতুর্য্যের কথা মনে আসে। এটি সাহিত্যে অবাঞ্ছনীয়ও নয়, কেননা সৌন্দর্য্য-বোধের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। কিন্তু এই শিল্পচাতুর্য্য সম্পর্কে এ-কথা কখনো ভোলা উচিত নয় যে এটি শিক্ষিত-পটুত্ব নয়, এর মূলে রয়েছে সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের গোপন প্রাণরস—সৌন্দর্য্যের মূলে যেমন স্বাস্থ্য। এই ব্যক্তিত্ব সাহিত্যিকদের কেমন করে লাভ হয় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্যের সন্ধান আজো আমরা পাইনি। তবে এই কথা জানি যে এর অস্তিত্ব

সাহিত্যিকরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন, এবং এর প্রভাবে জীবন তাঁদের কাছে হয় অর্থপূর্ণ, জগৎ তাঁদের চোখে হয় বর্ণগন্ধময় চির-নূতন। এই উপলব্ধির গুণে তাঁরা হতে পারেন স্রষ্টা, স্বভাবের বিচিত্র সৃষ্টির মতোই যে সৃষ্টি জীবনীশক্তিপূর্ণ, কবি গ্যেটে যাকে বলেছেন—মানবজীবনের ভিতর দিয়ে বিধাতার এক নবপর্য্যায়ের সৃষ্টি। কিন্তু এ সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় অসঙ্গত, কেননা বাক্য শেষ হবে না, আর নতুন বন্ধু যাঁরা স্নেহ ও কৌতূহল-পরবশ হয়ে এসেছেন তাঁদের ধৈর্য্য অসীম নয়।

সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গে একটি ব্যাপারের উল্লেখই আমি আজ করবো—তার নাম আমি দিয়েছি পরিবেষ্টনের সঙ্গে প্রেমের যোগ। অন্যত্রও এর উল্লেখ আমি করেছি। আমাদের দেশ ও সাহিত্যের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, বার বার এর উল্লেখ অসঙ্গত নয়। জীবন যে তার চার-পাশের সব-কিছুর সঙ্গে দৃঢ়-সম্বদ্ধ কারো চোখেই তা না পড়ে পারে না; আর মানব-জীবনের উৎকর্ষের কথা ভাবতে গিয়ে বলতে হয়—উৎকৃষ্ট মানব-জীবনের অর্থ উৎকৃষ্ট মনোজীবন। সেই মনোজীবনের উৎকর্ষের মূলে একদিকে যেমন কৌতূহল অন্যদিকে তেম্‌নি প্রেম। প্রেমে ক্ষুদ্র অহমিকার বন্ধন থেকে মানুষ ক্রমাগত মুক্তি পেয়ে চলে, জীবনে নব নব আশা ও আনন্দ-লাভ তার পক্ষে সম্ভবপর হয়, অন্য কথায়, তার ব্যক্তিত্বের পরিবর্দ্ধন ঘটে। কৌতূহলের ব্যাপারে গুরুমশায়ের প্রয়োজন আছে তা ত দেখতেই

পারা যাচ্ছে—নইলে এত বীক্ষণাগার সভ্যজগতে দেখা দিত না—কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে গুরুমশায়ের প্রয়োজন ঠিক নেই, বরং প্রয়োজন আছে তাঁদের জবরদস্তি থেকে নিজেদের উদ্ধার করবার। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে—জল স্থল অন্তরীক্ষ, সমস্ত নীরব ও সরব বন্ধু—সবারই সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ রয়েছে, সেই যোগ সহজ ভাবে আমরা অনুভব করতে পারি; কিন্তু গুরুমশায়ের দল ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে হুকুম চালান এর কতকগুলোকে সবলে আঁকড়ে ধরতে আর বাকী-গুলো উপেক্ষা করতে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক:—যারা আমাদের মিত্র নয়, যেমন, রোগ, দারিদ্র্য, প্রবলের অত্যাচার, এদের সম্বন্ধে অত্যধিক হুশিয়ার হবার তাগিদ এঁরা বার বার আমাদের দেন; কিন্তু যারা আমাদের মিত্র, যেমন, স্বাস্থ্য, সখ্য, বিশ্ব-প্রকৃতির মাধুর্য্য, এসব জীবনের জন্য যে কত বড় সম্পদ সেদিকে এঁদের দৃষ্টি অত্যন্ত কম। জীবন ঋণাত্মক নয়, ধনাত্মক—রোগ-প্রতিকারের ব্যবস্থার চাইতে তার জন্য অনেক বেশী মূল্যবান স্বাস্থ্যের আনন্দ-উপভোগে বাধার অল্পতা। জীবনের খতিয়ানে জন্মসূত্রে পাওয়া এই জমার অঙ্ক মানুষের চোখে যেন পড়তেই চায় না, তার চাইতে যে ভালবাসে খরচের অঙ্কের কথা ভেবে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাতে। বলা বাহুল্য, সন্তোষ পরম ধন—ঠিক এই তত্ত্বের প্রচার আমার কাম্য নয়; সন্তোষ অনেক সময়ে অজ্ঞতার প্রতিরূপ; আমি বলছি জীবনানন্দের কথা—জীবনের মতোই যা সহজ। জীবনকে সমৃদ্ধিময় করার ক্ষমতা তারই

আছে, যেমন রোগ-প্রতিকারের ক্ষমতা আছে জীবনী-শক্তির— সে-ক্ষমতা ওষুধেরও নেই উৎকণ্ঠারও নেই। বিধাতার পরম আশীর্ব্বাদ এই যে জীবনানন্দ, পরিবেষ্টন তার লালয়িতা এবং সে-লালন ক্রিয়া তত সুন্দর ও সার্থক হয় যত নিবিড় যোগ ঘটে এই দুয়ের মধ্যে।

এই যোগ সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথাও বলবার আছে। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর চিন্তাশীল বহুদিন ধরে বলে আসছেন —আমাদের জীবন-ব্যাপার সব দিক থেকে পঙ্গু হয়ে আসছে, এর কারণ, ইয়োরোপের নতুন ধরণ ধারণ আমরা অনুকরণ করে চলেছি —আমাদের চিরাচরিত জীবন-ধারা আমাদের অনাদরের সামগ্রী হয়েছে। এঁরাও পরিবেষ্টনের সঙ্গে নিবিড় যোগের কথা বলেন। কিন্তু এঁদের চিন্তার ত্রুটি এই যে জীবনের সম্প্রসারণের প্রয়োজন ও সম্ভাবনার কথা এঁরা বোঝেন না, বরং সেটি এঁদের মনে সঞ্চারিত করে অনিশ্চয়তার ভয়। কিন্তু যত সাধু-ইচ্ছা-প্রণোদিতই হোক, এই ভয় অবাঞ্ছিত। পর্ব্বত থেকে উৎসারিত হয়েছে যে ঝরণাধারা সে পর্ব্বতে সংলগ্ন থেকে পর্ব্বতের সঙ্গে তার অত্যাবশ্যক যোগ রক্ষা করে না—সে-যোগ রক্ষা পায় পর্ব্বতের অকৃপণতায় আর ঝরণার নিরন্তর প্রবাহিত হবার ক্ষমতায়। জীবন সম্প্রসারণশীল, যে-জীবন সম্প্রসারণশীল নয় তা জীবনই নয়—এই কথাটি মনে রাখার প্রয়োজন আছে। পরিবেষ্টনের সঙ্গে যোগ হয়ত প্রেমের যোগই হয় না যদি সম্প্রসারণের আনন্দ জীবনে না জাগে। সম্প্রসারণশীল জীবনই আস্বাদ করতে পারে পরিবেষ্টনের যত

মধু—যেমন পরিবারকে নব নব গৌরবের ভাগী করে তার দেশদেশান্তরগামী সম্পদ-আহরণশীল পুত্রই।—জীবন ও পরিবেষ্টনের যোগ সম্বন্ধে যা বলা হলো সেটি ব্যাপকভাবে জীবন সম্বন্ধেই, ঠিক সাহিত্য-সম্পর্কে নয়। কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টি বিস্তারিত জীবন-ক্রিয়ার একটি ব্যাপার—এ কথাটির পূরো মূল্য দিতে সাহিত্যিকদের যেন কখনো ভুল না হয়।

আমাদের দেশে যেমন পরিবর্ত্তন-ভীত দল আছেন তেমনি আছেন পরিবর্ত্তন-লোলুপ দল। বলা বাহুল্য এই দুইই অস্বাভাবিক মানুষের দল। এর বড় কারণ মনে হয় রাজনৈতিক। বহুকাল ধরে এদেশে একত্র-সমাবেশ ঘটেছে দৃপ্ত শাসক ও পরিম্লান শাসিতদের—তার ফলে দেশের মানস-লোকে দেখা দিয়েছে স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি ও অনুরাগ তেমন নয় যেমন একদিকে তীব্র বিতৃষ্ণা অন্যদিকে তীব্র আকর্ষণ। এ অনুমান যদি যথার্থ হয় তবে দেশে স্বাভাবিক সৃষ্টিধর্ম্মী মানুষের উদ্ভব যে একান্ত বিঘ্ন-সঙ্কুল—সেজন্যে সাহিত্যের উদ্ভবও কম বিঘ্নসঙ্কুল নয়—সে কথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এত নৈরাশ্য থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়ও এ যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে। জনসাধারণ ও শাসক-সম্প্রদায় এই দুয়ের ভিতরে যে ভয়ের সম্বন্ধ এতদিন রাজনীতির খুব বড় একটা বিষয় ছিল, আজ চিন্তাশীলদের চেষ্টায় প্রমাণিত হয়েছে—তা মায়া, রাজশক্তির প্রকৃত অধিকারী জনসাধারণ; সে-শক্তি ততদিন অন্যের হাতে থাকে যতদিন জনসাধারণ নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন না হয়। আমাদের

অভীপ্সিত সৃষ্টিধর্ম্মী জীবন ও ব্যক্তিত্ব-লাভ যে আমাদের এই বহু-নিন্দিত দেশেও সম্ভবপর এই দিক দিয়ে দেখলে সে-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় মনে হয়। এই সৃষ্টিধর্ম্মী জীবন ও ব্যক্তিত্ব-লাভ বিষয়ে আপনারা নিঃসন্দেহ হোন—আজ এই আমার প্রধান নিবেদন।

সাহিত্য-সম্মেলনে দেশের সৃষ্ট সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া সাধারণ নিয়ম। আপনারা কেউ কেউ এ বিষয়ে যোগ্য আলোচনা করবেন আশা করি। আমি নিজে এ বিষয়ে দুই একটি কথা নিবেদন করবো মাত্র। এই সাহিত্যের মূল্য-নিরূপণের কিছু চেষ্টা আজ হচ্ছে। কিন্তু সেই চেষ্টার অনেকখানিই অপচেষ্টা, কেননা সাহিত্যিক বিবেচনা ভিন্ন—সাহিত্যিক বিবেচনার অন্য নাম পূর্ণ সত্যান্বেষণ—অন্য কোনো ধরণের বিবেচনার কথা সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে উঠ্‌লে দেশে সাহিত্যের মর্য্যাদার হানি ঘটে, সত্যানুসন্ধিৎসা লাঞ্ছিত হয়। এমন বিচার-বিভ্রাট অবশ্য দুর্লভ নয়; যেমন দুর্লভ নয় দুর্ভিক্ষ মহামারি রাষ্ট্রবিপ্লব; তবে এমন দিনে সাহিত্যিকদের সচেতনতার প্রয়োজন হয় বেশী—সঙ্কটাপন্ন রোগী সম্বন্ধে যেমন প্রয়োজন হয় পরিচর্য্যারতদের পূর্ণ সতর্কতার। যে ক্ষেত্রে এই নব সাহিত্যের জন্ম তার নাম দেওয়া যেতে পারে—ইংরেজ শাসকদের প্রসন্নতা-লালিত বাংলার মধ্যবিত্ত হিন্দু-সমাজ। এই প্রসন্নতায় এই মধ্যবিত্ত হিন্দুর অন্তরে যে-আনন্দ জেগেছিল তার সবটুকু অনাবিল হতে পারে না, কেননা, স্বার্থবোধ তার সঙ্গে জড়িত। এহেন

আনন্দের সৃষ্টি যে সাহিত্য তারও অনেকখানি অংশ তাই সাহিত্যে অপাঙ্‌ক্তেয়—স্বল্পতুষ্টি, অদূরদর্শিতা, ভাব-বিলাসিতা, অভিমান, এমন কি কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ-লোলুপতা, একে করেছে এমন হতশ্রী। কিন্তু ইংরেজের এই প্রসন্নতা এই মধ্যবিত্ত হিন্দুর একটি ক্ষুদ্র অংশে সত্যকার জীবনানন্দও জাগিয়েছিল—সেই আনন্দও বাংলা সাহিত্যে রূপ লাভ করেছে এবং তাতে দেশ ধন্য হয়েছে। (এককালে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্পর্শে এক শ্রেণীর মুসলমানের অন্তরেও জেগেছিল এমন অনাবিল প্রসন্নতা—সে-প্রসন্নতাও জগৎ তার ভাণ্ডারে সাদরে স্থান দিয়েছে।) পরবর্ত্তীরা পূর্ব্ববর্ত্তীদের যদি বুঝতেই চায় তবে পূর্ব্ববর্ত্তীদের ভাল মন্দ সব-কিছুই তাদের বুঝতে হবে—পল্লবগ্রাহিতা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু বোঝার চাইতেও বড় কথা 'হওয়া'। সেই 'হওয়া'র ব্যাপারে অতীত আমাদের সাহায্য করে যা তার শ্রেষ্ঠ অংশ, তার প্রেরণা-কেন্দ্র, তাই দিয়ে—সুদর্শন বা কুদর্শন সব প্রদীপ যেমন অন্য প্রদীপকে সাহায্য করে মাত্র তার শিখা দিয়ে। বাংলা সাহিত্যে আবর্জ্জনা যতই থাকুক—কোন্ সাহিত্যেই বা আবর্জ্জনা নেই—তার মণিকোঠায় জ্বলছে যে রত্নদীপ তার সন্ধান যদি দেশ না রাখে তবে দেশ দুর্ভাগ্য।

শুনেছি এই পূরবী সাহিত্য-সম্মেলনের পশ্চাতে উদ্যোক্তাদের একটি উদ্দেশ্যও আছে—তাঁরা সম্মিলিত-কণ্ঠে ঘোষণা করতে চান যে বাংলা সাহিত্যে গণ-সংযোগের কথা বিশেষভাবে ভাববার দিন এসেছে। হয়ত সাহিত্যে এই গণ-সংযোগ তাঁদের বিশেষ ভাবনার বিষয় হয়েছে এটি গণতান্ত্রিক যুগ বলে, আর দেশের

অতি-আধুনিক সাহিত্যে খেয়ালীপনা একটু বেশী চলেছে বলে। তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ, এবং এর প্রতি আমার শ্রদ্ধার অভাব নেই। শুধু আমার আজকার প্রধান বক্তব্য এই সম্পর্কে পুনরায় আমি স্মরণ করবো—সাহিত্য ব্যক্তিত্বের দান, সেই ব্যক্তিত্ব পরিবেষ্টনের রসে লালিত, তার নব নব উন্মেষে পরিবেষ্টনের লাভ হয় নব নব সার্থকতার শ্রী। সাহিত্যে কৃপার অবকাশ নেই—একথাটি বার বার স্মরণ করবার মতো। অতি বড় কবিও তাঁর পাঠকদের প্রতি কৃপা বিতরণ করেন না—তিনি পরম শ্রদ্ধায় তাঁদের উপহার দেন তাঁর অপূর্ব্ব-অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবন। তেমন উপহার পেয়ে নির্ধন ও ধনবান সবাই খুশী হয়—উপকৃত হয় ত বটেই।

সাহিত্যে গণ-সংযোগের কথা ভাববার একটি বিশেষ প্রয়োজনও আছে বাংলার সাহিত্যের ভাষার জন্য। সে-ভাষা সংস্কৃতশব্দ-বহুল, নিঃসন্দেহ। এতে উপকার যে না হয়েছে তা নয়—বাংলা ভাষার প্রকাশ-সামর্থ্য এতে বেড়েছে। কিন্তু ক্ষতি এই হয়েছে যে, জনসাধারণ ও শিক্ষিত দল এ দুয়ের ভিতরে ব্যবধান বিস্তীর্ণতর হবার পথে চলেছে। জনসাধারণের ভিতরে যদি শিক্ষা পরিব্যাপ্ত হয় তবে এর কিছু প্রতিকার হবে; সেই সঙ্গে ভাষাকে আরো প্রাকৃতজনবোধ্য করতে চেষ্টা করা সুপরামর্শ। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষায় সাহিত্য-রচনা হতে পারে কি না সে কথাও ভাববার মতো। কিন্তু একথা সাহিত্যিকদের ভুললে চলবে না যে, জনসাধারণ তাঁদের

কৃপার পাত্র নয় কখনো—তারা উপহার চায় সাহিত্যই, হিতকথা বা উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা মাত্র নয়। সহজবোধ্য ভাষাও সাহিত্যিক-শ্রী-ভূষিত হতে পারে—সুরুচিসম্পন্না তন্বীর দেহে যেমন সাধারণ বস্ত্রও হয়ে ওঠে শ্রীময়।

পরিশেষে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করবার আছে পূরবী সাহিত্য-সম্মেলন যাঁরা আহ্বান করেছেন সেই পূরবী সাহিত্য-সমাজের প্রতি। যাঁরা এঁদের রচনার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন, এঁদের জন্মভূমি এঁদের অন্তরে আনন্দময় রূপ নিয়েছে, এঁদের রচনায় তারই প্রকাশ-ব্যাকুলতা রয়েছে—দেশের সাহিত্যিকদের জন্য এটি সুসংবাদ। আপনারা পুনরায় আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

চট্টগ্রাম পূরবী সাহিত্য-সম্মেলনে অভিভাষণ—আশ্বিন, ১৩৪৭,

শরৎ-প্রতিভা

কয়েক বৎসর আগেকার একটি আলোচনায় শরৎ-সাহিত্যকে আমি ভাগ করেছিলাম দুই ভাগে—প্রাক্-শ্রীকান্ত আর শ্রীকান্ত-পরবর্ত্তী। বড়দিদি, বিরাজ বৌ, পণ্ডিত মশাই, পল্লীসমাজ এগুলো ফেলেছিলাম প্রথম ভাগে, আর শ্রীকান্ত, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, শেষপ্রশ্ন—এগুলো ফেলেছিলাম দ্বিতীয় ভাগে। কোনো সাহিত্যিকের রচনার বিভাগ করা হয় সাধারণতঃ তাঁর চিন্তার গতিভঙ্গি ও সৃষ্টিকুশলতার উন্নতি অবনতির দিকে দৃষ্টি রেখে; এ ক্ষেত্রেও আমি বলতে চেষ্টা করেছিলাম যে প্রথম ভাগে শরৎচন্দ্রের ভাবুকতা ও অঙ্কন-কৃতিত্ব যা প্রকাশ পেয়েছে দ্বিতীয় ভাগে তা প্রকাশ পেয়েছে কিছু স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে। আমার সেই আলোচনার পরে শরৎচন্দ্রের দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্ব আর বিপ্রদাস। তার ফলে আমার পূর্ব্ব মত সামান্য একটু বিশেষিত করবার প্রয়োজন হয়েছে, আর শরৎ-প্রতিভার পূর্ণ রূপ উপলব্ধির সহায়তাও হয়েছে, বিশেষ করে মৃত্যুতে যখন তাঁর জীবন ও প্রতিভা হয়েছে কালের আঙিনায় নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখার মতো।

শরৎসাহিত্যের সেই দুই ভাগের প্রথমটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হয়েছিল এই—বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বাংলা উপন্যাসের যে ধারা প্রবর্ত্তিত হয়েছে তার একটি সাধারণ লক্ষণ এই যে তা

দেশের চারপাশের দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবনকে মণ্ডিত করে দেখেছে একটি মহিমময় স্বপ্নে। সাহিত্য-সৃষ্টির দিক দিয়ে দেখতে গেলে বলা যায় না এটি একান্তই নিন্দনীয়, কেননা, যা অপূর্ণাঙ্গ, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, সেই প্রতিদিনের জীবনকে সাহিত্যে দান করা হয় পূর্ণাঙ্গতা—অচঞ্চল রূপ। তবে স্বপ্নেরও শ্রেণী-বিভাগ সম্ভবপর; নিদ্রিতের মতো চোখ বুজে বুজে দীর্ঘ স্বপ্ন দেখবার যে চেষ্টা তা জীবনে নিন্দনীয়—সাহিত্যেও প্রশংসনীয় নয়। বাংলা উপন্যাসের সাধারণ লক্ষণ যে এত নিন্দিত তা বলবার মতো নিন্দা-চর্চ্চায় আমাদের আনন্দ নেই; তবে তা যে অনেকখানি সুলভ-ভাববিলাসিতা-পূর্ণ একথা না বলে উপায়ও নেই। শরৎচন্দ্র প্রথমেই পাঠকদের সামনে দেখা দিয়েছিলেন নিপুণ শিল্পীরূপে; তবু তাঁর রচনার প্রথম ভাগ বাংলা উপন্যাসের সাধারণ লক্ষণাক্রান্ত বলতে, অর্থাৎ অনেকখানি ভাববিলাসী বলতে, যে আমরা সাহসী হয়েছি তার কারণ, সাহিত্যে মাত্র বর্ণনা-কৌশলই শ্রেষ্ঠ সম্পদ নয় যদিও মূল্যবান সম্পদ; যা জীবনে গভীরভাবে সত্য তাকে প্রকাশ করবার যে কৌশল তাইই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বর্ণনা-কৌশল—তাইই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্পদ। একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—পল্লী সমাজ। বাঙালীর একালের নাগরিক জীবনের তুচ্ছতায় ও কৃত্রিমতায় লজ্জিত হয়ে যাঁরা এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে চান যে সত্যকার বাঙালী-জীবন পল্লীগ্রামে এখনো সগৌরবে আপনার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে তাঁরা যে কতদূর আত্ম-প্রবঞ্চিত এখানে সেইটি

শরৎচন্দ্রের একটি প্রতিপাদ্য এবং পল্লীজীবনের রুগ্নতা ও কদর্য্যতার চিত্র যে-নিপুণতার সঙ্গে তিনি অঙ্কিত করেছেন যে কোনো শিল্পীর জন্য তা অগৌরবের নয়। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণতা থাকলেও জিজ্ঞাসায় গভীরতা যে নেই—আর সে জন্যে তাঁর এই ধরণের সৃষ্টির সাহিত্যিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে নি—তা বোঝা গেল তখন যখন পল্লীমাতা জ্যাঠাইমা আর পল্লীর নবীন প্রাণ রমেশের কথোপকথন থেকে সিদ্ধান্ত দাঁড়ালো যে পল্লীর দুর্দ্দশার কারণ—পল্লীর শ্রেষ্ঠ সন্তানরা পল্লী ছেড়ে শহরবাসী হয়েছে, আর হিন্দু-পল্লী বিশেষভাবে দুর্দ্দশা-গ্রস্ত কেননা হিন্দু-সমাজে ধর্ম্ম অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায়-বোধ বেশী শিথিল হয়ে পড়েছে। পল্লীর শ্রেষ্ঠ সন্তানরা কেন পল্লী ত্যাগ করে গেলেন, তাঁরা ইচ্ছা করলেই আবার পল্লী-মায়ের কোলে ফিরে আস্‌তে পারেন কি না, হিন্দু-সমাজে ধর্ম্মহীনতা যদি বেশী প্রকট হয়ে থাকে তবে কোন্ বিশেষ কারণে তা হলো, যে সব সমাজের অদৃষ্ট হিন্দুসমাজের মতো অত মন্দ নয় তারা কোন্ বিশেষ পুণ্যে এমন ভাগ্যবন্ত হলো, অথবা আর একটু বেশী খোঁজ নিয়ে দেখ্‌লে তারাও হিন্দুরই মতো দুর্ভাগ্য বিবেচিত হবে কি না—এ সব প্রয়োজনীয় কথার কোনো আলোচনায়ই তিনি অগ্রসর হন নি। এর উত্তরে অবশ্য বলা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র এখানে সমাজতত্ত্ব আলোচনা করতে বসেন নি—কিন্তু বাস্তবিকই যে তিনি বসেন নি, বসবার চেষ্টা যা করেছেন তা না করারই মতো, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলে

তাঁকে বোঝার সহায়তা হয়, অর্থাৎ কোথায় তাঁর সত্যকার শক্তি আর কোথায় নয় সে বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়। দ্বিতীয়ভাগে কিন্তু শিল্প-চাতুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে নবীন ভাবুকতার সন্ধানও আমরা শরৎ-প্রতিভায় পাই, এই আমাদের বক্তব্য ছিল। দ্বিতীয়ভাগে শ্রেষ্ঠতর শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় শরৎচন্দ্র দিয়েছেন কেননা মানুষের জীবনের সঙ্গে তাঁর গভীরতর পরিচয়ের কথা সেখানে ব্যক্ত হয়েছে, এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেরই মতো নিঃসন্দেহ; কিন্তু নবীন ভাবুকতা বলতে যে ব্যাপারটি আমাদের চোখে পড়েছিল সেটি আরো যত্ন করে দেখা দরকার, একথা বলতে হচ্ছে। এই নবীন ভাবুকতার শ্রেষ্ঠ পরিচয়স্থলরূপে আমি দাঁড় করিয়েছিলাম 'শেষ প্রশ্ন' যেখানে নারীর পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব ও মানুষের সদাজাগ্রতচিত্ততা শরৎচন্দ্রের প্রতিপাদ্য হয়েছে। এই ধরণের চিন্তা অবশ্য এ দেশেও পুরোপুরি নূতন নয়, কিন্তু শরৎচন্দ্র যখন নব অনুরাগে একে সমর্থন করলেন তখন নূতন ভাবুকতার সৃষ্টি তাঁর মধ্যে হলো একথা বলা যায়। কিন্তু শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্বে আর বিপ্রদাসে দেখা যাচ্ছে নারীর পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব ও মানুষের সদা-জাগ্রতচিত্ততা বলতে এ যুগের লোকে যা বোঝে তার প্রতি তাঁর বিরাগ হয়ত নেই কিন্তু আমাদের দেশের চিরাচরিত আদর্শ বলতে যা বোঝা যায়, যেমন ভগবদ্‌ভক্তি ও নারীর বধূত্ব ও গৃহিণীত্ব, এ সবের উপর তাঁর আস্থা প্রচুর—হয়ত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সদাজাগ্রতচিত্ততার চাইতে প্রচুরতর। অথচ শরৎচন্দ্র নিজে বহুবার বলেছেন যে তিনি নাস্তিক, আর ভগবদ্‌ভক্তি বলতে

মানুষের যে মনোভাব বোঝায় তাকে বাইরে থেকেই তিনি যা দেখেছেন, তার ভিতরে প্রবেশ করবার আগ্রহ কখনো তাঁর মনে জেগেছে তাঁর রচনায় তেমন পরিচয় নেই বলেই ত মনে হয়। বলা বাহুল্য শরৎচন্দ্রকে অধার্ম্মিক আমরা বলছি না, তাঁর চিত্তের প্রবণতা কোন্ দিকে তা পরে আমরা বুঝতে চেষ্টা করবো, আমরা দেখছি ভক্তিভাবের প্রতি তাঁর এই অদ্ভুত শ্রদ্ধা। শুনেছি, বাংলা দেশের কোনো খ্যাতনামা সমাজতন্ত্রী এই বলে তাঁকে ঠাট্টা করেছেন যে শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্ব আর বিপ্রদাস লিখে তিনি তাঁর পূর্ব্ব বিদ্রোহের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

কিন্তু শরৎচন্দ্রকে এমনভাবে অপরাধী করা যে যায় না তা বোঝা যায় তাঁর প্রতিভার মূল শক্তির কথা ভাবলে। তাঁর প্রতিভার সেই মূল শক্তি অনেকের মতে, সমবেদনা—যে দুঃখী, যে বঞ্চিত, যে অত্যাচারিত তার প্রতি সীমাহীন সমবেদনা—সে-সমবেদনায় নিজেকে একেবারে উজাড় করে দেওয়া ভিন্ন তাঁর যেন আর গত্যন্তর নেই। এ সমবেদনার দুর্জ্জয় স্রোতো-বেগে তাঁর ব্যক্তিগত দৃঢ়মূল সংস্কারও যে কেমন করে বিধ্বস্ত, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তার প্রমাণ তাঁর গৃহদাহের কেদার মুখুয্যে। অনেক শিক্ষিত হিন্দুর মতো শরৎচন্দ্রও ব্রাহ্মদের প্রতি অনুকূল ছিলেন না; তাঁর রচনায় তাঁর সে-মনোভাব গোপন করবার চেষ্টাও তিনি করেন নি। কিন্তু তাঁর এত অপ্রীতিভাজন সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিরও কন্যার দুষ্কৃতির জন্য মর্ম্মান্তিক লজ্জা তিনি যেখানে অঙ্কিত করেছেন সেখানে তাঁর ব্যক্তিগত অনুরাগ-

বিদ্বেষ কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে। লজ্জিত পিতার সে-বেদনায় যেন নিজে দগ্ধ হয়ে তার পরিমান তিনি পাঠকদের অন্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। এই বেদনার আগুনে পরিণতবয়স্ক কেদার মুখুয্যে যে কি তীব্রভাবে দগ্ধ হলেন, তাঁর জাবন কেমন আত্যন্ত বদলে গেল, তিনি যেন নতুন জীবন নিয়ে জেগে উঠলেন—সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে সে একটি আশ্চর্য্য সৃষ্টি। আমাদের মনে হয় মানুষের জন্য এই যে তাঁর স্বাভাবিক দরদ এইই তাঁকে নিয়ে গেছে তার পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি ও সদাজাগ্রতচিত্ততার মাহাত্ম্য উপলব্ধির দিকে, আবার এইই তাঁকে সময়ে শ্রদ্ধান্বিত করেছে চিরাচরিত সামাজিক আদর্শের প্রতি, কেননা, তাঁর চারপাশের জীবনে নূতন নূতন পথ ও মতের ধ্বংস-রূপ তাঁর চোখে কম পড়বার কথা নয়। সমবেদনার আতিশয্য একই সঙ্গে হয়েছে তাঁর শক্তি ও দুর্ব্বলতার হেতু।

শিল্পী শরৎচন্দ্রের মর্য্যাদা ভাবুক শরৎচন্দ্রের মর্য্যাদার চাইতে যে বেশী এ কথা আমি পূর্ব্বেও নিবেদন করেছি। এখন সেই কথাটি এইভাবে একটু বিশেষিত করা দরকার যে শিল্পী শরৎচন্দ্রের মর্য্যাদার সঙ্গে ভাবুক শরৎচন্দ্রের মর্য্যাদার হয়ত তুলনা হয় না। শরৎচন্দ্রের এই ভাবুকতার বিড়ম্বনার জন্য দায়ী তাঁর সমবেদনার আতিশয্য এ কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে আরো একটি ব্যাপারের দিকে দেশের শিক্ষিতদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া সমীচীন মনে করি—সেটি একালের বাঙালী জীবনের একটি বড় ব্যাপার। একালের বাংলা সাহিত্যের মূল

প্রেরণাস্থল কি সে-সম্বন্ধে তর্ক উঠেছে। যাঁরা উত্তর দিয়েছেন, এর মূল প্রেরণাস্থল ইংরেজ ও ইংরেজির সংস্পর্শ তাঁরা একালের সাহিত্য-প্রচেষ্টা যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন বলা যায় না। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—একালের সাহিত্যের এই দিক্‌পালদের মাত্র মধুসূদনকে বলা যায় বিশেষভাবে ইংরেজ ও ইংরেজির অথবা ইয়োরোপের সংস্পর্শ-চঞ্চল। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধেও এ কথা ভাবা দরকার যে দৈবানুগৃহীত জীবনের চাইতে দৈব-লাঞ্ছিত জীবন যে তাঁর প্রতিভায় মাহাত্ম্যমণ্ডিত হলো তার মূলে গ্রীক সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়, না তৎকালীন দেবদ্বিজ-দ্বেষী নব্য হিন্দু-কলেজীয়দের সঙ্গে একান্ত-দৈবাধীন রক্ষণশীল সমাজের বিরোধ। আর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে ত ভাল করে বোঝাই যায় না যদি তাঁদের সমসাময়িক বাঙালী-জীবনের বিচিত্র ভাব ও কর্ম্ম-চেষ্টার সঙ্গে আমাদের পরিচয় না থাকে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই সমসাময়িক প্রভাব এত স্পষ্ট যে সে-সম্বন্ধে বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। বঙ্কিম-সাহিত্যেও জীবনের গতি-পরিণতি, আদর্শের তারতম্য, ধর্ম্ম, দেশাত্ম-বোধ, লোক-শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে যে প্রবল উৎকণ্ঠা ও আকুলতা দেখা যায়, তা যথাযথভাবে বুঝতে হলে শরণ নিতে হবে তাঁর সমসাময়িক জীবনের ইতিহাসেরই। একথা বললে চলবে না যে বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যতঃ জীবন-শিল্পী, তাঁর অন্য ধরণের সমস্ত চেষ্টা অপচেষ্টা তা সে-সবের সমসাময়িক মূল্য যতই থাকুক। এই সব শিল্পেতর চেষ্টা তাঁর মর্ম্মে সঞ্চারিত হয়েছে, তাঁর প্রতিভাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। প্রতিভাবান্‌কে

বুঝতে হয় তাঁর সফল ও নিষ্ফল উভয়বিধ চেষ্টার ভিতর দিয়ে।

আরো একটি দেখবার বিষয় এই যে ইংরেজ ও ইংরেজির সংস্পর্শ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের জন্যও দুর্লভ ছিল না, কিন্তু সে-সংস্পর্শ বাংলার মতো সাহিত্যিক ফসল ফলায় নি। এমন কি সে-সংস্পর্শ ব্যাপকভাবে বাংলার সামাজিক জীবনে যে সাড়া জাগিয়েছিল মুখ্যত তাইই নবজীবনের বার্ত্তা পৌঁছে দিয়েছে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে। সাহিত্য ব্যক্তি-বিশেষের বা সঙ্ঘ-বিশেষের সোখীন ভাব-চর্চ্চা নয়, বৃহত্তর দেশ বা জাতির নব নব চেতনা-লাভের ইতিহাস—এ মত সর্ব্ববাদিসম্মত কি না জানি না, কিন্তু মনে হয় সর্ব্ববাদিসম্মত হবারই এ যোগ্য। বাংলার একালের সাহিত্যকে এই দৃষ্টিভূমি থেকে না দেখলে এর প্রকৃত রূপ, অর্থাৎ এর শক্তির ও দুর্ব্বলতার যথাযথ পরিচয়, যে আমাদের চোখে ধরা পড়বে না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই বলেই মনে হয়। আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের জন্য ইংরেজ ও ইংরেজির সংস্পর্শের গুরুত্ব অস্বীকার করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, শুধু সেই সঙ্গে এই কথাটি বুঝতে হবে যে এই সংস্পর্শ সার্থক হতে পেরেছে এই সাহিতিকদের চতুষ্পার্শ্বের বৃহত্তর জীবনের শক্তিতে—বীজ যেমন সার্থক হয় উপযুক্ত ক্ষেত্রে।

বাংলার একালের সাহিত্যের ধাত্রীস্বরূপ সেই বৃহত্তর জীবন-ক্ষেত্রের, অন্য কথায় উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের, স্বরূপ কি? এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা সম্প্রতি শুরু হয়েছে,

আমাদের এ সম্বন্ধে যা ধারণা হয়েছে সংক্ষেপে তা নিবেদন করা যায় এইভাবে :—সৃষ্টি-ধর্ম্ম, অর্থাৎ জীবনের নব সম্ভাব্যতায় প্রত্যয়, এ যুগের বাঙালী-জীবনে সক্রিয় হয়েছিল, এবং ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে তার প্রকাশ ঘটেছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে অভিমান-ধর্ম্ম, অর্থাৎ পরিবর্ত্তন-বিরোধিতাও, নিষ্ক্রিয় থাকে নি, তারও শক্তি ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছিল। এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির ধ্বস্তাধ্বস্তি আশ্চর্য্যভাবে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে—এক শতাব্দী পরেও সুনিশ্চিত জয় কোনো পক্ষের ভাগ্যে লাভ হয় নি।—কেউ কেউ বল্‌তে পারেন, এ সংঘর্ষে পরিবর্ত্তন-বিরোধিতাই জয়ী হয়েছে, কিন্তু তা যে সত্য নয় তা বোঝা যায় এই থেকে যে যাঁরা নিজেদের পরিবর্ত্তন-বিরোধী মনে করেন জীবনে তাঁরা তা নন, শুধু পরিবর্ত্তন-বিরোধিতার অভিমান তাঁদের অন্তরে প্রবল। বৃহত্তর সমাজ-জীবনে এই যে ভাব-বিরোধ, দ্বিধা, জাতির পৌরুষ নিষ্ফল করবার কি আশ্চর্য্য শক্তি এর আছে তা সহজেই অনুমেয়। একালের বাংলার ব্যাপক নিষ্ফলতার মূলে এই ভাব-বিরোধ কি না সে কথাটিও বিচার্য্য। কিন্তু আমরা বলতে চাচ্ছি, এই ভাব-বিরোধ ও দ্বিধার সন্ততিরূপেই দেখা দিয়েছে একালের বাংলা সাহিত্যের অতি-পরিচিত ভাব-বিলাসিতা। এই ভাব-বিলাসিতার ফলে বাংলার ভদ্র-সাহিত্যেরও বেশীর ভাগ অংশ যে অপাঠ্য সাহিত্য-রসিকরা তা জানেন। একালের

বাংলা সাহিত্যের যাঁরা নমস্য তাঁদেরও চিন্তা ও সৃষ্টি যে এর প্রভাবে মাঝে মাঝে কিরূপ দুর্ব্বল ও শ্রীহীন হয়েছে তার অনুসন্ধান একটি যোগ্য সাহিত্যিক বিষয়। শরৎচন্দ্রের ভাবুকতার বিড়ম্বনার মূলে একালের বাঙালী-জীবনের এই মূলীভূত দুর্ব্বলতাও যে রয়েছে এই ভাবে দেখলে তা বোঝা কঠিন হয় না। অবশ্য প্রতিবাদের অবকাশও এখানে আছে। কোনো সাহিত্যই ভাববিলাসিতা থেকে মুক্ত নয় একথা কেউ কেউ বলতে পারেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে এই ভাববিলাসিতা বাস্তবিকই অসঙ্গত রকমে বেশী। এর একটি প্রমাণস্বরূপ দাঁড় করানো যেতে পারে এই ব্যাপার যে বাংলায় বিচার-সাহিত্য আজো ক্ষীণাঙ্গ।

কোনো অসাধারণ ভাবুকতা নয় কিন্তু অসাধারণ অঙ্কন-কুশলতা যার মূলে অসাধারণ সমবেদনা-বোধ—শরৎ-প্রতিভার পরিচয় সম্বন্ধে এই যে সমসাময়িক মত, এটি কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে মনে হয়। কিন্তু রসিক ও ভাবুকের উপলব্ধির বিষয়—সেই সমবেদনা-বোধ ও অঙ্কন-কুশলতার গুণে বিফল-ভাবুকতা বা ভাববিলাসিতার সমস্ত অপরাধ সত্ত্বেও শরৎ-সাহিত্যে সঞ্চিত হয়েছে মানুষের অন্তরাত্মার পরিতৃপ্তির কি অভাবনীয় আয়োজন। সত্যের ব্যাখ্যানে ত্রুটি তাঁর যতই হোক সত্যকে দেখবার মতো সাহস আর আঁকবার মতো অকুণ্ঠিত রেখাপাত তাঁর প্রতিভায় কখনো কখনো যে সম্ভবপর হয়েছে এতেই তাঁর সাহিত্য-প্রচেষ্টা হতে পেরেছে কালজয়ী—এই মনে হয়।

শরৎচন্দ্রের এই সমবেদনা-বোধ আরো একটু সূক্ষ্মভাবে দেখা

দরকার। এর নাম দেওয়া হয়েছে সমবেদনা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ তার চাইতে বলবত্তর বা মহত্তর সামগ্রী। এর মূলে একদিকে অদম্য কৌতূহল অন্যদিকে মানুষ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা—সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মানুষের অন্তরতম মাহাত্ম্যে তাঁর বিশ্বাস। নারীপ্রকৃতির মাহাত্ম্যে তিনি একান্ত শ্রদ্ধাশীল একথা সুবিদিত, কিন্তু শুধু নারীর মাহাত্ম্যে নয় ব্যাপকভাবে মানুষের মাহাত্ম্যে তিনি বিশ্বাসবান্—মানুষ যে স্বভাবতঃ সুন্দর ও মহৎ, সে-মাহাত্ম্য জীবনের সঙ্কট মুহূর্তে তাকে দেবদত্ত বর্ম্মের মতো ঘিরে দাঁড়ায়, তার জীবনকে অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যে বিভূষিত করে, যেমন স্বেচ্ছাচারী সুরেশের অন্তিম মুহূর্ত পরম মহিমময় হলো—একথা ভাবতে তাঁর আত্মার আনন্দ।—তাঁর অদম্য কৌতূহলপ্রবণতাও তাঁর প্রতিভার সার্থকতার এক বড় কারণ হয়েছে। এর গুণে তাঁর রচনা হতে পেরেছে পাঠকদের এত প্রিয়। জীবনের দুর্গম গহনে তাঁকে সঞ্চালিত করবার ক্ষমতাও এর কম নয়। এই অদম্য কৌতূহলপ্রবণতা মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ অসংযত হয়ে তাঁর রচনার হানিকর যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু এরই গুণে যে সমুদ্রে ঝড়ের সেই অপূর্ব্ব বর্ণনা আমরা পেয়েছি তা নিঃসন্দেহ। এই সঙ্গে শ্মশানে সেই অমাবস্যা-রাত্রির বর্ণনাটিরও উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু সেটি তাঁর এই অদম্য কৌতূহলপ্রবণতার গুণ ও দোষ উভয়েরই পরিচায়ক।

মানুষের অন্তরতম মাহাত্ম্যে শরৎচন্দ্রের যে বিশ্বাস তা অতি সত্যবস্তু—ভাবালুতার সামগ্রী নয় আদৌ। এজন্য এটিকে আমি অন্যত্র বলেছি শরৎচন্দ্রের ধর্ম্ম-বিশ্বাস। যাঁকে সকলে ঈশ্বর বলেন

তিনি তাঁর পূজারী কি না জানা যায় না, কিন্তু বেদনা-লাঞ্ছিত মানুষ (অথবা জীব) তাঁর দেবতা। এই দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় বাংলার গত যুগের সঙ্গে তাঁর কি নিগূঢ় যোগ, কেননা বাংলার গতযুগ তার শ্রেষ্ঠ অর্থে একটি ধর্ম্ম-যুগ—প্রত্যয়শীলতার যুগ। আর এই দিক দিয়ে দেখলে আরো বোঝা যায়, তাঁর প্রথম যুগের অনেক পাঠক তাঁকে যে দুর্নীতির প্রচারক জ্ঞান করেছিলেন তাঁদের সে-ধারণা কত তুচ্ছ। জীবন যাঁর এত বড় শ্রদ্ধার বস্তু তিনি যদি দুর্নীতির প্রচারক হন তবে সুনীতি ও দুর্নীতি সত্যকার অর্থ হারায়।

শরৎচন্দ্রকে বলা যায় বাংলার গত যুগের সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান, কেননা তাঁর পরে আমাদের সাহিত্যে যে-ধারা চলেছে কোনো প্রত্যয়, কোনো প্রবল কামনা, তার অন্তরে নয়, মোটের উপর তা উৎসাহ-প্রাচুর্য্যের যুগ, ভাষান্তরে, অনুকরণের যুগ। অবশ্য অনুকরণ বলে তা যে কেবলই নিন্দনীয় তা নয়, কেননা অনুকরণের পরেই আসে স্বীকরণ এ দেখা যায়। তবে স্বীকরণের অভ্যুদয় না হওয়া পর্য্যন্ত অনুকরণ অনুকরণই, সাহিত্যে তা মোটের উপর বিরামের যুগ।

শরৎচন্দ্র নিজেকে নিঃশেষে দান করে যেতে পেরেছেন কিনা একথাও উঠেছে। যাঁরা তাঁর মুখে তাঁর শেষ সংকল্পের কথা শুনেছিলেন তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁরা বিশেষভাবে দুঃখিত হবেন এ স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সার্থকতা বিপুলতা বা বৈচিত্র্যে তত নয় যত গভীরতায়। শরৎ-প্রতিভা অশোচ্য—এইই মনে হয়।

১৯৩৮

বিষাদ-সিন্ধু

অনেকের ধারণা, মীর মোশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' জঙ্গনামা ও এই জাতীয় অন্যান্য পুঁথির সাধুভাষায় রূপান্তর মাত্র। লেখক নিজে বলেছেন: "পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' বিরচিত হইল।" তা উপকরণ যেখান থেকেই তিনি সংগ্রহ করুন, এই বইখানিতে তাঁর যে-কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তা অনন্যসাধারণ।

পুঁথি-সাহিত্যের লেখকদের সঙ্গে 'বিষাদ-সিন্ধু'-লেখকের বড় মিল হয়ত এইখানে যে দৈব-বলের অদ্ভুতত্বে বিশ্বাস তাঁরও ভিতরে প্রবল দেখা যাচ্ছে। দৈববলে বিশ্বাস মাত্রই সাহিত্যে বা জীবনে দোষার্হ নয়; কিন্তু এই বিশ্বাসের সঙ্গে যখন যোগ ঘটে অজ্ঞানের ও ভয়বিহ্বলতার, তখন এ হয়ে ওঠে জীবনের জন্য অভিশাপ—সাহিত্যেও একান্ত অবাঞ্ছিত। এই বিশ্বাসের জন্য 'বিষাদ-সিন্ধু'-কারের সাহিত্যিক ক্ষমতা যে অনেক জায়গায় ব্যর্থ হয়েছে, বিশেষ করে' ধর্ম্ম-বোধ সম্বন্ধে অতি-অকিঞ্চিৎকর ধারণার পরিচয় তিনি যে অনেক জায়গায় দিয়েছেন, যে-সব সবিস্তারে বল্‌বার প্রয়োজন করে না।

অথচ জীবন, ধর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যে অগভীর তা নয়। আক্তরের মুখে তিনি বলছেন: "ধার্ম্মিকের হৃদয় এক, ঈশ্বরভক্তের মন এক, আত্মা এক।" মানবজীবনের জটিলতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও যথেষ্ট।

তাঁর প্রতিভার স্বাভাবিক প্রবণতা আর ধর্ম্ম পরকাল ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, এই দুয়ের ভিতরে যে একটি বিরোধ দেখা যাচ্ছে, এটি তাঁর সম্বন্ধে বেশ ভাববার বিষয়। শোনা যায়, বহু সাহিত্য-ব্রতীর মতো তাঁরও যৌবন উচ্ছৃঙ্খলতায় কেটেছিল। হতে পারে 'বিষাদ-সিন্ধু'তে তাঁর যে নিয়তি-পূজা দেখা যাচ্ছে, এ সেই উচ্ছৃঙ্খলতার এক প্রতিক্রিয়া। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ, বিশেষ করে' তাঁর "গাজী মিঞার বস্তানি"-খানি পাওয়া গেলে তাঁর চিত্তের পুরোপুরি পরিচয় পাওয়া অনেকটা সহজ হতো। যাইই হোক, তাঁর এই অসার্থক নিয়তি-পূজার কথা ভুলে তাঁর সাহিত্যিক শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ যাতে লাভ হয়েছে তারই অনুসরণ কর্ত্তব্য।—কেউ কেউ বল্‌তে পারেন, কারবালার নিদারুণ প্রান্তরে কাসেম ও ইমাম হোসেনের যে বীরমূর্ত্তি তিনি দাঁড় করিয়েছেন, 'নিয়তি'র নিষ্ঠুর লীলা তাতে প্রকট। কিন্তু এখানে 'নিয়তি'র লীলা না দেখে, এটি মানবজীবনের এক করুণ কিন্তু সাধারণ পরিস্থিতি, একথাও ভাবা যেতে পারে। ইমাম-পরিবার ও তাঁদের সহচরবর্গ যে ভাগ্য-বিড়ম্বনায় কারবালায় এসে উপস্থিত হয়েছেন এ তাঁরা জানেন, কিন্তু বাস্তবিকই তেমন গভীর করে' জানেন না; কারবালায় তাঁদের অবস্থিতি এক সঙ্কটময় স্থানে অবস্থিতি মাত্র।

মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে মীর মোশার্‌রফ হোসেনের জন্ম। তাঁদের সঙ্গে তাঁর যোগ যে কত ঘনিষ্ঠ নানাদিক দিয়ে তা বিচার করে' দেখা যেতে পারে। তাঁর বাক্যের গঠন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুযায়ী—অবশ্য কিছু বেশী বাক্‌-বাহুল্য তাতে আছে; তাঁর

মন্ত্রী ও সেনাপতিদের মন্ত্রণায়, ঘটনার নাটকীয় বিন্যাসে এবং স্বাধীনতার জন্য দরদেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বুঝতে পারা যায়। কিন্তু তাঁর নিবিড়তম যোগ মধুসূদনের সঙ্গেই। বিষাদ-সিন্ধু গদ্যে লিখিত হলেও গদ্য-লেখকের পরিচ্ছন্নতা লেখকের দৃষ্টিতে নেই—তাঁর চোখে বরং কবির স্বাপ্নিকতা ; আর এঁর যা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, যেমন এজিদ-চরিত্র, এমাম-হোসেন, কাসেম ও মোহাম্মদ হানিফার বিক্রম, সবই কাব্যসৌন্দর্য্য-মাখা।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্যে'র বর্ণনার ছায়া যে মাঝে মাঝে 'বিষাদ-সিন্ধু'র উপরে পড়েছে শুধু তাই নয়, 'মেঘনাদবধে'র দুইটি চরিত্রের পরিকল্পনার সঙ্গে এর দুইটি চরিত্রের পরিকল্পনার গভীর মিল রয়েছে। 'মেঘনাদবধে'র শ্রেষ্ঠ চরিত্র রাবণ ; তাঁর শক্তি যেমন অপরিসীম, দুঃখও তেম্‌নি অফুরন্ত। রাবণের মতনই এজিদ শক্তিমান, কিন্তু তাঁর কামনার ধন জয়নাবকে তিনি যে লাভ করতে পারেন নাই এই দুঃখে তাঁর সমস্ত শক্তি বিপর্য্যস্ত—অস্থিরচিত্ততা তাঁর একমাত্র পরিচয়। তেম্‌নিভাবে 'মেঘনাদ-বধে'র সীতা-চরিত্রের মাধুর্য্য ও কোমলতার অনেকখানি সমাবেশ ঘটেছে 'বিষাদ-সিন্ধু'র জয়নাব-চরিত্রে। গ্রন্থের শেষের দিকে জয়নাবের যে দীর্ঘ আত্মবিলাপ রয়েছে তার সঙ্গে সীতা ও সরমার কথোপকথনের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে।

রোমান্টিক কবির যে ভাবোচ্ছ্বাস—একই সঙ্গে সেইটি 'বিষাদসিন্ধু'-কারের শক্তি ও দুর্ব্বলতার কারণ। এই ভাবোচ্ছ্বাসের জন্যই তাঁর গ্রন্থে চরিত্রের বৈচিত্র্যের পরিচয় যথেষ্ট

থাক্‌লেও পূর্ণাঙ্গ চরিত্র-সৃষ্টি কমই সম্ভবপর হয়েছে। এরও মধ্যে যাঁদের তিনি দোষে-গুণে মানুষ অথবা বিচক্ষণ সাংসারিক মানুষ রূপে আঁকতে চেয়েছেন, যেমন এজিদ, ওৎবেঅলীদ, আবদুল্লাহ্‌-জেয়াদ, মার্‌ওয়ান, জাএদা, গাজী রহমান, তাঁরা অনেকাংশে এক একটি স্বতন্ত্র মানুষ হয়ে উঠেছেন, কিন্তু যাঁদের তিনি ধার্ম্মিক অথবা আদর্শস্থানীয় মানুষ রূপে আঁকতে চেয়েছেন, যেমন এজিদের পিতা মাবিয়া, ইমাম পরিবারের নরনারী, মদিনা-বাসিগণ ও মোহাম্মদ হানিফার যোদ্ধবৃন্দ, তাঁদের বীরত্বের প্রকাশ মাঝে মাঝে মনোরম হলেও ইমাম হাসান ও জয়নাব ব্যতীত তাঁরা প্রায় সবাই মোটের উপর কথা ও ধর্ম্মাচারের সমষ্টি-মাত্র হয়ে উঠেছেন। জয়নাবের কথা আগেই বলা হয়েছে; ইমাম হাসানের চরিত্র বাস্তবিক বড় মধুর করে' 'বিষাদসিন্ধু'-কার এঁকেছেন। যে-বৃদ্ধ নিজের মনের বিষে তাঁকে বর্শা ফেলে মেরেছিল তার প্রতি ও তাঁর প্রাণঘাতিনী স্ত্রী জাএদার প্রতি তাঁর যে ব্যবহার তা বড় সৌজন্যময়। সেকালের পীর-বাদ ও সুফীমত-বাদ-প্রভাবান্বিত সম্ভ্রান্ত মুস্‌লিম পরিবারে লেখকের জন্ম, ইমাম হাসানের চরিত্রে যে স্নেহ ও সৌজন্য তিনি অঙ্কিত করতে পেরেছেন তা আমাদের একালের ওহাবী-প্রভাবান্বিত সমাজে দুর্লভ হলেও সেকালের সমাজে তেমন দুর্লভ ছিল না। চরিত্রের পরিকল্পনায় এই লেখকের একটি বিশেষ কৃতিত্বও প্রকাশ পেয়েছে; তাঁর সমস্ত নায়ক-নায়িকাই স্বাভাবিক মানুষ, এক সীমার ব্যতীত অমানুষ "শয়তান" কেহই হয়ে ওঠে নাই—যদিও

'শয়তান' বিশেষণে তিনি বহু নায়ক-নায়িকাকে বিশেষিত করেছেন। চরিত্র হিসাবে সামারে অবশ্য কোনো বৈশিষ্ট্য ফোটে নাই, সে যেন নিয়তির হাতের যন্ত্র মাত্র।

জনসাধারণের যে সমাদর, এই শক্তিমান সাহিত্যিক নিজের বলেই তা লাভ করেছেন। তাঁর সমস্ত রচনা ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করে' তাঁর প্রতিভার প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধানিবেদন এখন সাহিত্যরসিকদের কর্ত্তব্য। তাঁর ছোট বড় তিন চারখানি বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে, তার প্রত্যেকটিতেই কিছু না-কিছু সাহিত্যিক শক্তির চিহ্ন বিদ্যমান দেখেছি। দোষে গুণে মীর মোশাররফ হোসেন বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকদের মধ্যে এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

১৩৪১

বঙ্কিমচন্দ্র

চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র লোকান্তরিত হন। এই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকালে তাঁর প্রতিভা এক বিশেষ রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর দেশবাসীর সামনে। তাঁদের এক দল তাঁকে ভাবছেন দানব, অপর দল ভাবছেন দেবতা। এই পূজা ও ঘৃণা পরস্পরের রসের জোগানে যেভাবে স্ফীতি লাভ ক'রে চলেছে তা অদ্ভুত।

যাঁরা পরিচিত কর্ম্মীরূপে তাঁদের সাধনা যদি দক্ষিণে ও বামে স্তুতি ও নিন্দার উদ্রেক করে চলে তবে এক হিসাবে সেটি হয় তাঁদের জন্য গৌরবের, কেননা কর্ম্মের অর্থই পক্ষপাত—এক কূলের বৃদ্ধি অন্য কূলের ক্ষয়। কিন্তু যাঁরা পরিচিত কবি-সাহিত্যিকরূপে তাঁদের প্রয়াসের এমন পরিণতি বেদনাদায়ক, তাঁরা স্বভাবতঃ প্রেমিক—প্রেমের বলে তাঁরা মানবচিত্তের গহনে প্রবেশ-পথ পান, প্রেমিক বলেই তাঁরা দেশ কাল নির্ব্বিশেষে মানুষের সমাদর লাভ করেন। প্রেমের দেবতার পূজায় যদি ঘৃণার অঞ্জলি নিবেদিত হয় তবে পূজা নিরানন্দ হয়, নিরর্থকও হয়।

যাঁরা কবি-সাহিত্যিক বা জ্ঞানব্রতী তাঁদের ভাগ্যেও এমন বিড়ম্বনা যে কখনো ঘটে না তা নয়। শোনা যায় দার্শনিক স্পিনোজার কবরের উপরে ইহুদি আর খৃষ্টান দুই সম্প্রদায়ের লোক দুই-এক শতাব্দী কাল ধরে' নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেছিলেন।

কিন্তু কালে তাঁদের উভয়ের যোগ্য সমাদর থেকে এই জ্ঞানী বঞ্চিত হননি। বঙ্কিমচন্দ্রেরও তেম্‌নি সুদিন আস্‌বে কি না সেকথা আজ ভাবা মন্দ নয়।

যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দা, অর্থাৎ মুসলমান-বিদ্বেষ, সে-অপরাধে তাঁকে সহজেই অপরাধী না ভাবা যায় এই বিবেচনা থেকে যে মীরকাসেম, দলনী বেগম, চাঁদশা-ফকির, ওসমান প্রভৃতি কয়েকটি সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে উৎকৃষ্ট মুসলমান চরিত্র তাঁর কলম থেকে উৎরেছে, আর "বঙ্গদেশের কৃষকে" ও "সাম্যে" তিনি যাদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন তারা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দুঃস্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতির ভিতরে একটি ঔদ্ধত্য ছিল—হতে পারে সেটি শক্তির ঔদ্ধত্য—সেই ঔদ্ধত্য সহজেই যুদ্ধং দেহি বলে দাঁড়িয়েছে বিজেতার ঔদ্ধত্যের সামনে তা সে-বিজেতা সেকালের মুসলমানই হোক আর একালের ইংরেজই হোক, আর তাঁর দেশের লোক বা সম্প্রদায়ের লোক এই বিজেতাদের সামনে যত হীনপ্রভই হোক, এইই তাঁর তথাকথিত বিদ্বেষ সম্পর্কে যথার্থ কথা বলে মনে হয়।

কিন্তু মুসলমান নামে একটি সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষের অপরাধ তাঁর না থাকলেও হিন্দু নামে আর একটি সম্প্রদায়ের ভালোর জন্যে তাঁর যে মাত্রাতিরিক্ত উৎকণ্ঠা প্রতিভাবান্‌ হিসাবে সেটি তাঁর একটি অপরাধ। স্বজন-বাৎসল্য সাধারণতঃ মানুষের ভিতরে প্রবল এ উত্তর এখানে উত্তর নয়, কেননা, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের কাছে একজন জ্ঞানব্রতী সাহিত্যিক যাঁদের

কাছে মানুষ কামনা করে এবং পায় স্বজন-বাৎসল্যের চাইতে উঁচুদরের জিনিষ—তার নাম সত্যাশ্রয়িতা আর মানবতা। এ কথার ভুল অর্থ সহজেই করা যায় এই ভেবে যে আমরা সাহিত্যে একান্তভাবে নির্বিশেষের সাধনার কথা বলছি। সে-কথা বলা সম্ভবপর নয় কেননা বিশেষকে নিয়েই সাহিত্যের চিরদিনের কারবার, নির্বিশেষের দ্যুতি আপনা থেকে তাতে খেলে। কবির কথায় এ ব্যাপারকে বলা যায়—'ভাব থেকে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।' এই অবিরাম যাওয়া আসায় ব্যাঘাত ঘটলেই সাহিত্যসৃষ্টি অসুন্দর অর্থাৎ অসার্থক হয়। দেশ-কালের বিশেষ রূপ যাতে না ফুটেছে তা সাহিত্য হয় নি এ কথা যতখানি সত্য, সেই দেশ-কালের রূপে সত্যাশ্রয়িতার ও মানবতার চিরন্তন দ্যুতি যদি না ফুটে থাকে তবে তাও সাহিত্য হয় নি, এও ততখানি সত্য। বঙ্কিমচন্দ্রও হিন্দুত্বের জয়-ঘোষণা যত উচ্চ কণ্ঠেই করে' থাকুন সার্থক জয়-ঘোষণা তিনি যা করতে পেরেছেন তা সত্যের আর মানুষেরই—আর সেই জন্যই তিনি প্রতিভাবান্—তাঁর রচনা একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে তা বোঝা কঠিন হবে না।

বুঝতে চেষ্টা করা যাক তাঁর আনন্দমঠের হিন্দুশক্তির পুনরুত্থান-তত্ত্ব—যার জন্য অসম্ভব রকমের স্তুতি আর নিন্দা তাঁর লাভ হয়েছে। ধ্বংসোন্মুখ মুসলমান-রাজশক্তি হিন্দু বিদ্রোহীরা নির্মূল করতে চেষ্টা করলে মনের সাধ মিটিয়ে, এ পর্য্যন্ত কিছু পরিমাণে বোঝা গেল হিন্দুশক্তির পুনরুত্থানের কথা। কিন্তু সেই বিদ্রোহী-দলে ক্রমে ক্রমে দেখা দিল নানা ত্রুটি—হিন্দুরাজ্য-

স্থাপন তাদের দ্বারা হলো না, এই বিদ্রোহীদের নেতা সত্যানন্দের মনোদুঃখেরও আর অন্ত রইল না। তখন বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেন সুদূর ভবিষ্যতের পানে যেখানে হিন্দুশক্তির পুনরুত্থানের একান্ত সম্ভাবনা রয়েছে লোকশিক্ষক ইংরেজের আনুকূল্যের ফলে। কিন্তু সেই ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে তিনি হিন্দুত্ব বল্লেন কাকে? "তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম্ম নহে সে একটা অপকৃষ্ট লৌকিক ধর্ম্ম···হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক"— হিন্দুত্বের এই সংজ্ঞা তিনি দিলেন চিকিৎসকের মুখে। কিন্তু এ সংজ্ঞা বাস্তবিকই হিন্দুত্বের বিশেষত্বের পরিচায়ক হলো না। ধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক কর্ম্মাত্মক নয় এ মত অনেক ধর্ম্ম-সাধক তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম্ম সম্বন্ধেও দিয়েছেন। তা ছাড়া "তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম্ম নহে সে একটা অপকৃষ্ট লৌকিক ধর্ম্ম" এ কথা বলে' তিনি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে এমন একটি মত দিলেন যা হিন্দুধর্ম্মের অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতার মতের বিরুদ্ধ। একালের স্বনামধন্য রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা ভাবা যাক। "তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম্ম নহে" এ পর্য্যন্ত এঁর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধ নেই; কিন্তু সে একটা অপকৃষ্ট লৌকিক ধর্ম্ম, এ কথা রামকৃষ্ণের সিদ্ধান্ত অনুসারে ধর্ম্ম বিষয়ে অজ্ঞতার পরিচায়ক। তা ছাড়া ব্যাপকভাবে হিন্দু-সমাজ একথা স্বীকার করছেন না যে তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা একটা অপকৃষ্ট লৌকিক ধর্ম্ম, এবং যাঁরা এমন কথা বলেছেন, যেমন ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃবৃন্দ, তাঁদের তাঁরা ভাবেন অনাত্মীয়। তেমনি

ভাবে অদ্ভুত তাঁর কৃষ্ণমাহাত্ম্য-ব্যাখ্যা ভক্তহিন্দুর চোখে। ভক্তির তন্ময়তার স্বাদে তিনি বঞ্চিত এভিন্ন আর কিছু যে তাঁর সম্বন্ধে ভক্তহিন্দুরা ভাববেন তা মনে হয় না।—কিন্তু হিন্দুত্বের ব্যাখ্যা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা ত্রুটিপূর্ণ হলেও বাস্তবপক্ষে তা কম অর্থপূর্ণ নয়। তিনি নিজেকে হিন্দুর যতবড় উদ্ধারকর্ত্তাই মনে করুন প্রকৃত কথা এই যে তিনি হচ্ছেন বিশেষভাবে তাঁর যুগের সন্তান—তাঁর যুগে সভ্যজগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সব সাধনা চলেছিল তিনি সে-সবের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত, আর সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের শক্তিতে তিনি দূর করতে চেয়েছিলেন তাঁর চারপাশের লোকদের ভাবালুতা, স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিতে চেয়েছিলেন তাদের জাগতিক জীবনে শ্রেয়োলাভের—চিরকালই কর্ম্মী ও চিন্তাশীলেরা যা করে থাকেন। মানুষের মুখের কথায় আর অন্তরের প্রবণতায় বিরোধ অবশ্য সুপরিচিত, সেই সঙ্গে আরো বুঝতে হবে—বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্তান, বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সন্তান, মোহ আর মোহমুক্তি এই দুয়ের ধ্বস্তাধ্বস্তি যে-যুগে উৎকট আকার ধারণ করেছিল।

হিন্দুত্বের আড়ম্বর বঙ্কিম-সাহিত্যে যতই থাকুক তাঁর সত্যকার প্রতিপাদ্য হিন্দুত্ব নয় মানবতা—একথা আরো স্পষ্ট করে বোঝা যায় তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের কথা ভাবলে। তাঁর রাজসিংহের বিখ্যাত বা কুখ্যাত জেবুন্নিসা-চরিত্রের কথা ভাবা যাক। তাঁর জেবুন্নিসা তাঁরই জেবুন্নিসা, ইতিহাসের জেবুন্নিসা নয়, সাহিত্য-শাস্ত্রে এ এক-রকমের স্বতঃসিদ্ধ। আর এই জেবুন্নিসা-চরিত্র তিনি

হীন করে এঁকেছেন না উৎকৃষ্ট করে এঁকেছেন তাও নির্দ্ধারিত হতে পারে সাহিত্যিক বিচারের দ্বারা, অন্য কোনো বিচার-পদ্ধতির দ্বারা নয়। জীবনে প্রকৃতভাবে হীন সে-ই যে তেজোহীন, সাহিত্যেও তেম্‌নি হীন চরিত্র সেইটিকে বলা যায় যা লেখকের অনুরাগপুষ্ট নয় সুতরাং পাঠকদেরও অনুরাগ আকর্ষণে অক্ষম। কিন্তু সমঝদারদের চোখে জেবুন্নিসা-চরিত্রটির মাথাই ত জেগে উঠেছে রাজসিংহ উপন্যাসের সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সন্ধি-অভিসন্ধির ঊর্দ্ধে! লেখক এঁকে প্রথমে পাঠকদের সামনে এনেছেন স্বেচ্ছাচারিণী দানবীরূপে; কিন্তু পরে পরে পরম যত্নে পরম কৌতূহলে তিনি দেখিয়ে চলেছেন এই দানবীর মর্ম্মবাসিনী প্রেমময়ী মানবীকে। রাজসিংহের উপসংহারে এমন দুই একটি কথা তিনি বলেছেন যা থেকে বোঝা যায় জেবুন্নিসাকে তিনি ভাল ভাবেন নি। কিন্তু চন্দ্রশেখরের শৈবলিনীকেও তিনি বলেছেন পাপীয়সী, আর আনন্দমঠের ভবানন্দকে কল্যাণীর মুখে বলেছেন দুরাচার পামর। অথচ যাদের তিনি সাধারণ বিচারে সাধু ও সাধ্বী করে এঁকেছেন তাদের সঙ্গে তুলনায় জেবুন্নিসা, শৈবলিনী ও ভবানন্দ, তাঁর এই তিনটি অসাধু চরিত্র, সাহিত্যিক সৃষ্টি হিসাবে কত বেশী গৌরবময়! বঙ্কিমচন্দ্রের মানব-চরিত্র-জ্ঞানের, মানুষের সঙ্গে সহজ আত্মীয়তার, কত গভীর পরিচয় এ-সবে রয়েছে!

অথচ তাঁর এই দুর্লভ সাহিত্যিক শক্তিও কম বিড়ম্বিত হয়নি তাঁর মাত্রাতিরিক্ত হিন্দুত্বের দ্বারা। তাঁর শেষ বয়সের কয়েকখানি উপন্যাসে তাঁর অঙ্কন-কৃতিত্ব যথেষ্ট প্রকাশ পেলেও মোটের উপর

তাঁর দৃষ্টি অতীতমুখী। অমোঘ বিশ্ববিধানে যে-জীবন হিন্দুরও জন্য সত্য হয়েছে বা হতে চলেছে তার প্রতি শ্রদ্ধার চাইতে অতীতের মোহ যে তাঁর হৃদয় বেশী অধিকার করেছে এজন্য তাঁর এইসব রচনা হয়েছে অনেকখানি সৌখীন—হিন্দুরও জন্য তা অনিষ্টকর ভিন্ন আর কিছু নয় যদি হিন্দু এ-সবের এই অন্তর্নিহিত ভাববিলাস সম্বন্ধে সজাগ না থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব আছে, মনে হয়। সহজভাবে তিনি জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের পূজারী, আবার প্রবলভাবে তিনি হিন্দুত্বের প্রচারক। এই প্রচারক-বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসংসা-কীর্ত্তনই এতদিন বিশেষভাবে হয়েছে। তার কারণও বোঝা যায় সহজে। বাংলাদেশের দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু আর মুসলমান; উনবিংশ শতাব্দীতে এই দুয়ের মধ্যে এক বড় রকমের ব্যবধান দেখা দিল। মুসলমান-দল করলে নব রাজশক্তির সঙ্গে প্রবল বিরোধিতা, হিন্দু-দল করলে প্রাণঢালা মিতালি। নিজেদের বিরূপতা আর রাজশক্তির অপ্রসন্নতা এই দুই শক্তির একমুখী টানে প্রাধান্যগর্ব্বিত মুসলমান-দল অন্তর্হিত হয়ে গেল দেশের আমদরবার থেকে, সেখানে আসর জমলো দীর্ঘদিনের অবহেলিত হিন্দুর। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের অবসানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারে বাংলার প্রধান অধিবাসী হলো হিন্দুই। এহেন পরিবেষ্টনে হিন্দুত্বের নব অভ্যুত্থানের স্বপ্ন ও সেই স্বপ্নের প্রসার শুধু স্বাভাবিক নয়, প্রায় অনিবার্য্য। এযুগের হিন্দু-সমাজের প্রায় প্রত্যেক

মস্তিষ্কবান্ ব্যক্তিই এই হিন্দুত্বের নব জাগরণের স্বপ্ন দেখেছেন —অবশ্য বিভিন্ন ভাবে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বিস্ময়ের কথা এই যে তাঁর মতো মনীষা ও সহজমানবতা-সম্পন্ন ব্যক্তি এই সাময়িক মোহে এত বেশী বিভ্রান্ত হয়েছেন।

আমরা যে-দৃষ্টিতে বঙ্কিম-প্রতিভার দিকে তাকাচ্ছি কেউ কেউ তাকে আগাগোড়া ভুল বলতে পারেন। তাঁদের বক্তব্য এই ধরণের :—হিন্দু আর মুসলমান দীর্ঘকাল এদেশে একসঙ্গে বসবাস করছে, মারামারিও তারা করছে আজকে থেকে নয়— এ মারামারি থামলো না। এমন বিরোধের পরিণতি অন্যান্য বহু দেশে যেমন হয়েছে ভারতেও তার ব্যত্যয় হবে মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের ও ইকবালের শক্তিশালী সাহিত্য হয়ত সেই নির্ম্মম কিন্তু অমোঘ বিধি-লিপি।

এই ধরণের চিন্তা সহজেই মনে হতে পারে অত্যন্ত বাস্তবমুখী বলে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এটি তা নয়। হিন্দু আর মুসলমানের এমন শক্তি-পরীক্ষার দিন—এর অভিনয় মাত্র নয়— আস্‌তে পারে সত্যকার রাজনৈতিক অধিকার যদি তাদের লাভ হয়। কিন্তু এমন অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের মনোভাবের নিত্যসঙ্গী ভয়, আর সেই ভয়ের অপরিহার্য্য গতি কোনো তৃতীয় পক্ষের আনুকূল্য লাভের দিকে। এই ভাবে একটু বিচার করে দেখ্‌লেই বোঝা যায়, এই তথাকথিত বাস্তবমুখী চিন্তাধারা থেকে কোনো-রকমের শক্তিলাভ দেশের লোকদের পক্ষে দুরাশা মাত্র। এর থেকে তাদের লাভ হতে পারে কেবল শক্তির অভিনয়-কুশলতা

—যথা, সভা-সমিতিতে পরস্পরের প্রতি কটূক্তি-বর্ষণ, সময় সময় কিঞ্চিৎ লাঠালাঠি ও ইট-পাটকেল-বৃষ্টি ইত্যাদি।—নিয়তি চির-অজ্ঞাত, মানুষের জন্য কাম্য যা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হয়েছে তার সাধনা।

সূচনায় আমরা উল্লেখ করেছিলাম বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁর একালের দেশবাসীদের নিবিড় ভক্তি আর উৎকট বিদ্বেষের কথা। আমাদের বিশ্বাস, কালে তাঁর পূজারী আর বিদ্বেষী দুই দলই লুপ্ত হবে, কেননা দুয়েরই উপজীব্য অজ্ঞানতা—সত্য হবে তাঁর প্রতিভার জন্য তাঁর প্রতি তাঁর সাহিত্যের পাঠকবর্গের শ্রদ্ধা। প্রতিভাবান্ অভ্রান্ত নন এ কথা তাঁরা বুঝবেন, সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তাঁরা বুঝবেন, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রতিভাবান্ পরম বরণীয়—বিধাতার দান—তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতিও একান্ত অর্থহীন নয়।

১৯৩৮

একালের জীবন ও একালের সাহিত্য

সুধীবৃন্দ, আপনাদের প্রীতির জন্য আপনারা আমার আন্তরিক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আপনারা যে-আসন আমাকে দান করেছেন সেটি একটি সম্মানিত সাহিত্যিক আসন। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে সাহিত্যিক সম্মান বড় দুর্লভ সামগ্রী—তা পাওয়া যায় একমাত্র কালের হাত থেকে। তাই শুধু আপনাদের অমূল্য প্রীতিই পরমশ্রদ্ধান্বিত অন্তরে গ্রহণ করবার অধিকার আমার আছে। আপনাদের আয়োজন সফলতামণ্ডিত হোক এই কামনা করি।

সাহিত্য-সম্মেলনকে আমাদের দেশের অনেক সাহিত্যিক দিন দিন বেশী করে' জ্ঞান করছেন সাহিত্যিক উৎসব। গুণিজনরঞ্জন ত্রিপুরাধিপের দেশে সে-উৎসব যে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু রস ধারণ করে কঠিন পাত্র, উৎসবও স্বরূপতঃ শক্তির ছটা—সাহিত্যিকরা এসব কথাও ভাল করেই জানেন। তাঁহাদের এবারকার সংযোগ দেশের জন্য একটি শুভ যোগ হোক।

বন্ধুগণ, আমাদের জন্মভূমি বাংলার বেশ এক দুঃসময় উপস্থিত হয়েছে। প্রায় একশত বৎসরের বিচিত্র ঘটনায় ও বিচিত্রতর সাধনায় যে-প্রতিষ্ঠা এদেশের লাভ হয়েছিল আজ তাতে বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছে। পরিবর্ত্তন জগতের নিয়ম। সে-পরিবর্ত্তন যদি

আমূল হয় সেটিও স্বভাবের বহির্ভূত হয় না। কিন্তু আমাদের দুঃখ এই যে এই পরিবর্ত্তন-স্রোতে আমরা যেন অসহায়ভাবে ভেসে চলেছি। এ'কে নিয়ন্ত্রিত করবার কথা আমরা যেন ভাবতে পারছি না। এতকাল যাঁরা এদেশে নেতৃস্থানে ছিলেন তাঁরা আজ বাস্তবিকই দিশাহারা, আর যাঁরা এই সন্ধিক্ষণে নব-নেতৃত্বের দাবি করছেন, তাঁরাও মর্ম্মে মর্ম্মে জানেন, প্রতি মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় তাঁরা উত্তেজিত হয়ে চলেছেন মাত্র।

জাতীয় জীবনের এমন সন্ধিক্ষণ সাহিত্যিকদের জন্য বড় পীড়াদায়ক। তার প্রধান কারণ তাঁরা আনন্দজীবী—আনন্দিত পরিবেষ্টন ভিন্ন তাঁরা যেন নিশ্বাস গ্রহণ করতে পারেন না। কিন্তু আত্মরক্ষার অনুকূল একটি গোপন শক্তিরও তাঁরা অধিকারী। মাছ যেমন শত্রুর তাড়া পেয়ে আশ্রয় করে জলের গভীর তলদেশ, সঙ্কটকালে সাহিত্যকরাও তেমনি সবলে আঁকড়ে ধরেন আনন্দের ভিত্তিভূমি যে সত্য তাকে। জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণের সাহিত্য তাই চিরদিন সৌন্দর্য্য ও আনন্দের পূজারী মুখ্যভাবে নয় বরং মুখ্যভাবে নিরাভরণ সত্যের পূজারী। মনে হয়, সেই নিরাভরণ সত্যের সম্মুখীন হবার দিন বাংলার সাহিত্যিকদের এসেছে।

সাহিত্য-সম্মেলনে অর্থাৎ সাহিত্যিকদের সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণও একটি সাহিত্যিক আলোচনা ভিন্ন আর কিছু নয়, আর কিছু হবার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবার সম্ভাবনাই বেশী —এই আমার ধারণা। আপনাদের অনুমতিক্রমে আমি বাংলার

একালের জীবন ও সাহিত্যের যোগ সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে চেষ্টা করব।

যাকে বলা হয় renaissance নব-জন্ম তেমন একটি ব্যাপার ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলা দেশে আরম্ভ হয়েছিল, আর পরে পরে তার প্রভাব শুধু বাংলায় নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে অনুভূত হয়েছিল, আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায় একথা জানেন। কিন্তু যেভাবে জানলে এমন একটি ব্যাপার যোগ্যভাবে জানা হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে, সেদিকে তাঁদের অনেকের মন কমই ধাবিত হয়েছে। বৃহত্তর দেশের এই নব-জন্মের বা নব-জাগরণের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আমাদের একালের গৌরবময় সাহিত্যের অভ্যুদয়। সে-অভ্যুদয় এক পরমাশ্চর্য্য ঘটনা। দেশের নব-জন্মের এক পরিচয়-স্থলরূপেই এর আবির্ভাব হলো নিঃসন্দেহ, কিন্তু যে-রূপ নিয়ে এ আবির্ভূত হলো তা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অশেষসম্ভাবনাপূর্ণ—এর সামনে দেশের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। সৌভাগ্যক্রমে এই বিস্ময়জাত সাহিত্যিক অক্ষমতা আমাদের কেটে যেতে বেশী দেরী হলো না। পদ্য ও গদ্য উভয় ক্ষেত্রে অচিরে যে সোনার ফসল ফল্‌লো তাতে দেশ ও জাতি ধন্য হলো।

অনেকের এই মত যে বাংলার একালের এই নব-জন্মের শ্রেষ্ঠ পরিচয়-স্থল তার একালের সাহিত্য। সাহিত্য ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন ধর্ম্মে ও শিল্পে, উচ্চাঙ্গের সাধকের আবির্ভাব একালের বাংলা দেশে ঘটেছে, এবং তাঁদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী

হয়েছে। তবু বাংলার একালের সাহিত্যকেই তার একালের নব-জন্মের শ্রেষ্ঠ পরিচয়-স্থল জ্ঞান করা যায় এই বিবেচনা থেকে যে সেই নব-জন্মের প্রায় সমস্ত লক্ষণ সুলিখিত হয়েছে এই সাহিত্যে। তা ছাড়া এই সাহিত্যেরই একজন শ্রেষ্ঠ সাধকের প্রভাব দেশের রাজনৈতিক জাগরণের সহায় হয়েছে, অপর একজন শ্রেষ্ঠ সাধকের প্রভাব বাংলার সর্ব্ববিধ কলাবিদ্যার উপরে অসামান্য।

সাহিত্যের ও সাহিত্য-সাধকের এমন সার্থকতা গৌরবময়। কিন্তু আমাদের সেই গৌরবময় সাহিত্যে এত শীগ্‌গির আনন্দহীনতা ও নিস্ফলতার ভয় জাগ্‌লো কেন? অবশ্য বাঙালীর সাহিত্য-প্রতিভা নিষ্ক্রিয় হয়নি আজো। আমাদের নবীন সাহিত্যিকদের হাত দিয়েও এখনো এমন দুই একখানি বই মাঝে মাঝে বেরুচ্ছে যা থেকে বুঝতে পারা যায়, এই নূতন সাহিত্যিক-বোধ জাতির মর্ম্মে সঞ্চারিত হয়েছে। তবু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আমাদের সাহিত্যের গতি-পরিণতি সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহ জেগেছে। আমাদের জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে যে বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে তাকে গুরুতর জ্ঞান না ক'রে আমরা পার্‌ছি না।

আমাদের এই সাহিত্যিক দুর্গতি সম্বন্ধে আমাদের যে-সব সাহিত্যিক চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন তাঁদের প্রধানতঃ দুই দলে ভাগ ক'রে দেখা যেতে পারে। এক দলের নাম দেওয়া যেতে পারে জাতীয়তাবাদী। তাঁদের কথাই প্রথমে

বুঝতে চেষ্টা করা যাক। তাঁরা অনেকখানি দ্বিধাহীন হ'য়ে বলতে চাচ্ছেন, বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান দুর্গতির কারণ—বাঙালী জাতির সঙ্গে তার সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেছে। এই সব জাতীয়তাবাদী আবার কয়েকটি উপদলে বিভক্ত। তাঁদের একদল বলছেন, *বাংলার সত্যকার সাহিত্য তার পল্লী-সাহিত্য।* আমাদের একালের যে-সাহিত্যের এত গৌরব করা হয় তা ইয়োরোপের অনুকরণমাত্র। কাজেই তা দেখতে যত জমকালো হোক তার মর্য্যাদাহীন হ'তে সময় না লাগবারই কথা। মনে হয় এই সাহিত্যের সেই পরীক্ষার দিন এসেছে।—অপর দল বলছেন, বাঙালীর সত্যকার জাতীয় পরিচয় এই যে সে হিন্দু। আজ যারা ধর্ম্মে অহিন্দু যুগ-যুগান্তের ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে তাদেরও হিন্দু ভিন্ন আর কিছু বলবার উপায় থাকে না। বাংলার একালের সাহিত্যে বাঙালীর সেই হিন্দুত্ব এক নূতন মহিমায় ফুটে উঠেছিল বলে তার এত গৌরব। কিন্তু ইয়োরোপের অন্ধ অনুকরণে আজ বাঙালী তার স্বধর্ম্ম ভুলেছে। আর যে ধর্ম্মভ্রষ্ট দুর্গতিই তার ভাগ্য।—তৃতীয় দল বাঙালীত্বের কিছু নতুন ব্যাখ্যা দেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যা বোঝা কিছু কঠিন কেননা তা প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাখ্যা নয়, বরং এক ধরণের মরমী অনুভূতির বিবৃতি। তাঁরা বলেন, বাঙালীর একটা নিজস্বতা আছে—সেইটিই হচ্ছে সব চাইতে বড় কথা। তার সেই নিজস্বতাকে যদি হিন্দুত্ব বলতে চাও বলতে পার, কেননা বাঙালীর হিন্দুত্ব বহুকালের; কিন্তু সেই

সঙ্গে এই কথাটি মনে রাখ্‌তে হবে যে, হিন্দুত্বের উৎস যে আর্য্যত্ব তার সঙ্গে বাঙালীর যোগ নেই। আর্য্যের কঠিন্য বাঙালীতে দুর্লভ। সে বরং ভাবে-ভোলা অনার্য্য—বুদ্ধির চাইতে হৃদয়াবেগের উপরে তার বেশী নির্ভর। এই বাঙালীকে দেখতে পাওয়া যায় বাংলা দেশের সর্ব্বত্র তা তার সামাজিক ও ধর্ম্মগত পরিচয় যাইই হোক। আর এই বাঙালীত্বই রূপ পেয়েছে নব নব ভঙ্গিতে তার সাহিত্যের বিভিন্ন পর্য্যায়ে। এই মূল বাঙালীত্বের সঙ্গে তার একালের সাহিত্যে যোগ ঘটেছিল বুদ্ধির ও চারিত্র শক্তির। ফলে বাঙালীত্বের এক অপূর্ব্ব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বাঙালী বিভ্রান্ত হয়েছে ইয়োরোপের ছটায়। তাই জীবনে ও সাহিত্যে সে আজ এমনভাবে বিড়ম্বিত।

বলা বাহুল্য আমাদের জাতীয়তাবাদীদের এই সব কথা মূলতঃ খেদোক্তি। বাংলার সমসাময়িক জীবনে যে বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছে তার সামনে এঁরা বিহ্বল হয়ে পড়েছেন—এঁদের বলবার কিছু নেই। বাংলার একালের সাহিত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে এঁদের উক্তিতেও রয়েছে এঁদের অক্ষমতার পরিচয়। মানুষের জীবনের ভূমিকা হচ্ছে দেশ ও কাল; তার সমস্ত প্রয়াসের উপরে এ দুয়ের প্রভাব যে পড়বে এ বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু কাল পরিবর্ত্তনশীল ত বটেই, দেশও মানুষের জন্য গূঢ়ভাবে পরিবর্ত্তনশীল। একালের বাঙালীচিত্তের উপরে শুধু ইয়োরোপের নয় প্রায় সমস্ত জগতের চিন্তা-ভাবনা কি বিচিত্র-

ভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের তাতে ভুল হওয়া উচিত নয়। এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ যে-সাহিত্য আমাদের লাভ হয়েছে তাতে আমাদের যুগযুগান্তের বাঙালীত্ব লাঞ্ছিত হয়নি নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই বাঙালীত্বই যে সে-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় একথা বল্‌লে একটি হেঁয়ালির অবতারণা করা হয় মাত্র, মানুষের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের দিকে তাকানো হয় না। এতে আমাদের এ যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মূল সাহিত্যিক প্রেরণার দিকেও তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় না। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সাহিত্যিক প্রেরণার ক্ষেত্র মুখ্য-ভাবে বঙ্গদেশে বা ভারতবর্ষে আবদ্ধ রাখেন নি একথা সবাই জানেন। এমন কি যাঁকে বাঙালীত্বের বা হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠ সাধক বলা হয় সেই বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর অন্তর্জীবন পুষ্ট করেছিলেন তাঁর সমসাময়িক ইয়োরোপীয় ভাব-রসে, একথাও আজ দেশের শিক্ষিত-সমাজে সুবিদিত। সাহিত্যে তথা জীবনে জাতীয়তার তত্ত্ব এইখানে বিশেষ অর্থপূর্ণ যে মানুষ তার মানস-জীবন লাভ করতে পারে না যদি পরিবেষ্টনের সঙ্গে তার যোগ দৃঢ় না হয়—যেমন গাছ গাছ হতে পারে না যদি তার শিকড় মাটিকে যথেষ্ট জোরে আঁকড়ে না ধরে। কিন্তু মানুষের জন্য এই দৃঢ় যোগের অর্থ হচ্ছে তার চারপাশের জীবনের সঙ্গে তার গভীর প্রেমের যোগ, তার আচারগত বা সান্নিধ্যগত, এমন কি শোণিতগত যোগ-মাত্র নয়। এই প্রেমে যে বলীয়ান্ স্রষ্টা হবার অধিকার কেবল তারই আছে। সেই প্রেমের

ভূমিকায় সে নির্ম্মাণ করতে পারে তার কীর্ত্তি-সৌধ বিচিত্র উপকরণে—যেমন তাজমহল নির্ম্মিত হয়েছিল দেশ বিদেশের উপকরণে ও নৈপুণ্যে কিন্তু মোগলদের সুনিবিড় ভারত-প্রেমের ভিত্তিতে।

আমাদের অপর ভাবুক-দলকে পরিচিত করা যেতে পারে আন্তর্জাতিকতাবাদী বলে। তাঁদের চিন্তা-ভাবনার ধারা কতকটা এই:—মানুষ দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে বিভক্ত নিঃসন্দেহ কিন্তু সভ্যতার প্রথম থেকেই এই সব বিভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যে শুধু উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময় হয়নি, চিন্তা-ভাবনার বিনিময়ও হয়েছে। সেজন্য কোনো জাতির সাহিত্যকে একান্ত-ভাবে জাতীয় ভাবা অবিবেচনা মাত্র—তা হোক না তাদের ভাষাগত বিভিন্নতা যথেষ্ট। সাহিত্যের প্রবণতা আন্তর্জাতিকতার দিকেই—যান-বাহনের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের সেই প্রবণতা দিন দিন প্রখরতর হয়ে উঠ্‌ছে। সাহিত্যকে বলা যেতে পারে উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট রুচির বাহন। সেজন্য জগতের যেখানে উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও উৎকৃষ্ট রুচির প্রকাশ ঘটেছে সে দিকে সহজেই অন্যান্য দেশের মনস্বীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। একালে ইয়োরোপের দিকে জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে সেই এক কারণেই। তাই এ যুগে ইয়োরোপের অনুসরণের বা অনুকরণের প্রশ্ন ঠিক ওঠে না, কেননা যে নামেই বলা হোক এ ভিন্ন আর কারো কিছু করবার নেই, কেউ কিছু করছেও না। বিজ্ঞান একান্তভাবে নৈর্ব্যক্তিক ও আন্তর্জাতিক।

সাহিত্য তেমন নৈর্ব্যক্তিক নয়। কিন্তু যেহেতু তা মুখ্যতঃ জ্ঞানের কথা সেজন্য সাহিত্যকেও মুখ্যভাবে আন্তর্জাতিক ভাবাই সঙ্গত। একালের বাংলা সাহিত্য যে জ্ঞাতসারে আন্তর্জাতিক হতে পেরেছে এ তার সৌভাগ্যের কথা এবং এই পথেই তা দেশে নূতন জ্ঞান-প্রবাহ এনেছে। কিন্তু একালে বাংলা সাহিত্যে ত্রুটি দেখা দিয়েছে এই প্রধান কারণে যে ইয়োরোপের, অর্থাৎ একালের শ্রেষ্ঠ জীবনায়োজনের, অনুসরণ তাতে যোগ্যভাবে হয়নি। ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও ইয়োরোপীয় জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেই সম্প্রসারণশীল জীবনে যত সমস্যা দেখা দিয়ে চলেছে, সাহিত্যে তার নিপুণ বিশ্লেষণ ও রূপায়ন হচ্ছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যিকদের এই ভুল হয়েছে যে বিশ্বের নিয়মে তাঁদের দেশেরও সমাজজীবনে যে পরিবর্ত্তন এসেছে তার দিকে তাঁদের দৃষ্টি যায়নি। তার পরিবর্ত্তে যে-সমাজের ভিতরে এই সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল তারই সুখ-দুঃখ-বর্ণনার অন্তহীন পুনরাবৃত্তিতে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে পেরেছেন। তাই বলা যেতে পারে, একালের বাংলা সাহিত্যে শক্তিহীনতা দেখা দিয়েছে ইয়োরোপের অনুকরণ বা অনুসরণ তাতে বেশী হয়েছে বলে নয় বরং বেশী, অর্থাৎ যোগ্যভাবে, হয়নি বলে'। দেশের জন্য এটি একটি সাহিত্যিক সঙ্কট সন্দেহ নেই। তবে আশা করা যায়, এই সঙ্কট কাটানো আমাদের সাহিত্যিকদের পক্ষে খুব কঠিন হবে না, কেননা, নিজেদের ত্রুটি সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন হয়েছেন। গণ-জীবনের যে মহিমা ও সম্ভাবনা একালের মানুষের চোখে পড়েছে তাকে

যথাযোগ্য রূপ দেবার চেষ্টা হলেই আমাদের সাহিত্য আবার নূতন শ্রী ধারণ করবে। তাতে এর অব্যবহিত পূর্ব্বের সাহিত্যের সঙ্গে এর পার্থক্য দেখা দেবে। কিন্তু সেইটিই স্বাভাবিক। সেই অব্যবহিত পূর্ব্বের সাহিত্যও তার পূর্ব্বের সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় শুধু আকৃতিতে বিভিন্ন নয় প্রকৃতিতেও বিভিন্ন। বাংলার একালের প্রগতিপন্থী সাহিত্য সম্বন্ধে যে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছে, মোটের উপর তা অজ্ঞতার কথা। মহামনীষী ফ্রয়েড একালে মানুষের মনের কার্য্যকলাপের যে অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়েছেন তার প্রভাব একালের সব দেশের সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যের উপরেও পড়েছে। মানুষ দিন দিন তার নিজের মন ও বাহ্য বস্তু দুয়েরই পূর্ণতর পরিচয় লাভের দিকে যাচ্ছে। সেই অভিযানের দিকে সন্দেহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দুর্ব্বলতার পরিচয় দেওয়া মাত্র। জ্ঞানের অগ্রগতির পথে যত বাধা জ্ঞানের শক্তিতেই সে-সব অপসারিত হয়েছে—ভবিষ্যতেও হবে।

জাতীয়তাবাদীদের মতো নৈরাশ্যপরায়ণ আন্তর্জাতিকতাবাদীরা নন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দেশের জীবনের, অথবা ভাবজীবনের, বর্ত্তমান সঙ্কট সম্বন্ধে তাঁরা হুশিয়ার; আর এও দেখা যাচ্ছে যে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধারের পথ তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না যদিও আশা করছেন যে উদ্ধার তাঁরা পাবেন। কিন্তু তাঁদের যা সম্বল তা দেখে বলা যায়—সফলতার সম্ভাবনা তাঁদের জন্য কম। তাঁদের অনেক কথা যুক্তিপূর্ণ। জীবন্ত ইয়োরোপের দিকে তাঁরা যে দেশের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন

এও ভাল কাজ করেছেন, কেননা জ্ঞান ও শক্তি সংক্রামক। যুগে যুগে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের রূপও বদলায় তাঁদের এই মত ভাববার মতো– অন্ততঃ উড়িয়ে দেবার মত নয়। তবু তাঁদের দীনশক্তি না বলে উপায় নেই এই কারণে যে তাঁদের প্রধান সম্বল উৎসাহ-প্রাচুর্য্য—যাকে বলা হয় অনুভূতি, সেই শ্রেষ্ঠ ধনে আজো তাঁরা বঞ্চিত। অবশ্য উৎসাহ-প্রাচুর্য্যের মূলেও অনুভূতি রয়েছে। কিন্তু যে-অনুভূতি মানুষকে সৃষ্টি-শক্তি দান করে তার প্রকৃতি উৎসাহ-প্রাচুর্য্যের চাইতে স্বতন্ত্র রকমের। এ সম্পর্কে রুশ সাহিত্য একটি ভাল দৃষ্টান্ত। জনসাধারণের কল্যাণ-কামনা সব দেশের চিন্তাশীলরাই করেছেন; কিন্তু রুশ সাহিত্যিকদের মনে ক্রিয়া করেছিল যে ভাব তার নাম জনসাধারণের শুভ-কামনা দিলে তার যোগ্য পরিচয় দেওয়া হয় না, তার নাম দেওয়া উচিত—জনসাধারণের অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্যে অসীম প্রত্যয়।—অনুভূতি ও প্রত্যয় এই দুটি কথা আজ আমার একান্ত শ্রদ্ধার উপহার আপনাদের সামনে। মনে হয়, ভাগ্য যে আমাদের প্রতি বিমুখ হয়েছেন তাঁকে নূতন করে' জয় করবার উপায় রয়েছে এই দুটি কথার মধ্যে।

অনুভূতি ও প্রত্যয়—এ দুটীকে বলা যেতে পারে মানুষের মনোজীবনের ভিত্তি—যে-মনোজীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের সমস্ত চেষ্টার মতো তার সাহিত্যিক চেষ্টাও। জাতীয়তাবাদী আর আন্তর্জাতিকতাবাদী আমাদের এই উভয়

দলের ভাবুকতার নিষ্ফলতা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করছে আমাদের মনোজীবনের বিকৃতির দিকে।

এই সম্পর্কে বাংলার নব-জন্ম বা নব-জাগরণের কথা সহজেই ওঠে। সে-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আমাদের নেই, কিন্তু এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করবার আছে যে সেই জাগরণ একটা সহজ ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হতে পারেনি, তার পরিবর্ত্তে বাধা ও অস্বীকৃতি পেয়েছে প্রচুর। বাধা এক হিসাবে গতির আনুষঙ্গিক। কিন্তু এমন বাধা আছে যা গতিকে ছন্দ-দান তেমন করে না যেমন করে ব্যাহত। আমাদের একালের জাগরণে তেমন বাধাই ঘটেছে। একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেব। রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্র দুজনই এই নবজাগরণের প্রতীক। রামমোহন পূর্ব্ববর্ত্তী; বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্ত্তী। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রামমোহনকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি, অন্ততঃ তাঁর প্রথম জীবনে। তাতে ক্ষতি ছিল না। বিভিন্ন সাধক সত্যকে দেখেন বিভিন্ন দিক থেকে। তাই তাঁদের মত-ভেদ যেমন স্বাভাবিক তেমনি সঙ্গত। তাতেই সমৃদ্ধ হয় মানুষের স ত্যের অভিজ্ঞতা। কিন্তু রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি-ভঙ্গির এই বিরোধ আমাদের দেশের শিক্ষিতদেরও সত্যের অভিজ্ঞতা বাড়ায়নি, বাড়িয়াছে সাম্প্রদায়িকতা। বলা বাহুল্য সত্যের সাধনার পথে এর চাইতে বড় দুর্গতি নেই।

এমনি বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যা থেকে বোঝা যায়, যে-জাগরণ আমাদের দেশে এসেছিল তার লক্ষণ যত অভ্রান্ত এবং যত

বিচিত্রই হোক আমাদের দেশের শিক্ষিতেরাও তাকে বুঝতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন নি। তাঁদের এমন অক্ষমতার একটি বড় কারণও আছে। রাজনৈতিক ভাগ্য যাদের মন্দ জীবনের পূর্ণ দায়িত্ব উপলব্ধির সুযোগ তাদের জন্য সংকীর্ণ। ফলে জীবনের পথে কোন্‌টি প্রধান আর কোন্‌টি অপ্রধান এ-তর্কের মীমাংসা আর তাদের জন্য হতে চায় না। বাস্তবিক এ এমন একটা সমস্যা যার সামনে আমাদের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা, আশা-উদ্দীপনা যেন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু নৈরাশ্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এই কথা বুঝলে যে যে-জীবনে আমাদের দেশে নব-জাগরণ ঘটেছিল তার সঙ্গে তুলনায় আমাদের আধুনিক জীবন কোনো দিক দিয়ে বেশী মন্দ নয়। সঙ্কট একালের জীবনে যথেষ্ট দেখা দিয়েছে, সেকালেও কম ছিল না। বাধা যত বড় হতে পারে মানুষের শক্তি যেন তার চাইতেও বড়—এ আশ্বাসে আশ্বস্ত হওয়া যায়।

অনুভূতি ও প্রত্যয়—এ দুয়ের বাস্তবিক এমন ক্ষমতা আছে যার দ্বারা আমাদের মনোজীবনের বিকৃতি নিরাকৃত হতে পারে। অনুভূতির সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে—আমাদের চারপাশের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আমাদের চেতনা। আর প্রত্যয়ের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে—জীবন ব্যর্থ হবার জন্য নয়, এমন একটা প্রসন্নতা অন্তরে লালন। সহজেই বোঝা যায়, এ দুটি বাদ দিয়ে কোনো মানুষেরই চলে না। কিন্তু কাজে আমরা এ দুটিকে অনেক সময়ে বাদ দিই, অন্ততঃ এদের পরিস্ফূর্তির পথে বাধা উপস্থিত করি। মনোজগৎকে সীমাবদ্ধ করবার চেষ্টা-মাত্রই হচ্ছে অনুভূতি ও

প্রত্যয়কে বিপন্ন করা। অবশ্য যখন আমরা কোনো একটি বিষয়ের বিশেষ অনুশীলনে রত হই আমাদের অনুভূতি ও প্রত্যয় তখন বিপন্ন হয় না বরং প্রবলভাবে সক্রিয় হয়। অনুভূতি ও প্রত্যয় বিপন্ন হয় যখন অন্ধ সংস্কারের কালো-মেঘে আমাদের চোখের সামনের সীমাহীন জগৎ সঙ্কুচিত হয়। অনুভূতি ও প্রত্যয় নির্বাধ হয়ে মানুষের মনোজীবনে যে পূর্ণতার সঞ্চার করে সৃষ্টির ব্যাপারে সেইটিই মানুষের পরম নির্ভর। সেই পূর্ণাঙ্গতার বিরোধী সমস্ত অন্ধতা ও ব্যস্ততা তাই সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার জন্য বাধা ভিন্ন আর কিছু নয় তা সেসবের নাম যত জমকালো হোক।

অনুভূতি ও প্রত্যয়-চর্চ্চার সঙ্গে আমাদের দেশের নবজাগরণ আমাদের জন্য চিরযুক্ত, কেননা, অনুভূতি ও প্রত্যয়ের অপূর্ব্ব প্রকাশ তাতে আমরা দেখি। যথেষ্ট বড় বাধা অতিক্রম করে আমাদের দেশ একালে যে জয়ী হয়েছিল আমাদের সেই সাফল্যের দিকে যদি সত্যকার অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টি আমরা নিক্ষেপ করতে পারি তবে একটা বড় যুগকেই যে আমরা রূপ দিতে পারব তা নয়, তাহলে আমাদের মনোজীবনে নূতন শক্তি-সঞ্চার হবে—সত্যের অকুণ্ঠিত অন্বেষণের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের সমস্ত অভিমান ও ভাববিলাস মর্ম্মান্তিক লজ্জায় মাথা নীচু করবে। রুশ সাহিত্যের মূলে আমরা দেখেছি জনসাধারণের মাহাত্ম্যে অসীম প্রত্যয়, আমাদের একালের নবজাগরণের যদি মূল লক্ষণের নাম করতে হয় তবে বলা যায়—তার নাম আত্ম-বিশ্বাস ও সীমাহীন কৌতূহল। পরমহংস রামকৃষ্ণের কথা ভাবা যাক—পল্লীর

নিরক্ষর ব্রাহ্মণ-সন্তান ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার তীব্রতায় ছুটেছেন বিধর্ম্মীর ধর্ম্ম-সাধনার দিকে, সে-সাধনায় সিদ্ধির জন্য বিধর্ম্মীর সমস্ত রকমের খাদ্য গ্রহণে তিনি উদ্যত! এই অসীম কৌতূহলের প্রভাবে এই যুগের অনেক সাধকের মতবাদে স্ববিরোধিতা দেখা দিয়েছে—যেমন বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে প্রবলভাবে হিন্দু এবং প্রবলভাবে সাম্যবাদী। কিন্তু জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে তাতে এ যুগের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় নি—সত্যান্বেষণের প্রতিক্রিয়া চিরদিন এমন বিচিত্র এবং গভীরভাবে অর্থপূর্ণ। এই যুগ যে আমাদের অন্তরে সত্যের অকুণ্ঠিত অন্বেষণের প্রবর্ত্তনা দেয়, সেজন্যে কাল এর মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ করতে পারবে বলে' মনে হয় না।

অনুভূতি ও প্রত্যয়ের লালন, এবং যে-জাগরণ আমাদের একালের সর্ব্ববিধ সৌভাগ্যের মূলে তার সম্বন্ধে অনাবিল চেতনা—আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কটে এ অমূল্য, একথা বলতে চেষ্টা করেছি। মনে হ'তে পারে, সাম্যবাদ ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিনে শুধু মনোজীবনের উপরে এতখানি জোর দিয়ে আমি আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কটকে অত্যন্ত ছোট করে দেখেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। আর যিনি যাই বলুন, সাহিত্যিক-দৃষ্টিতে মানুষ মুখ্যতঃ মনোজীবী। সে-দৃষ্টিকে ভ্রান্ত বলা যায় না। চির-উপেক্ষিতগণ যে আজ নূতন মহিমা লাভ ক'রেছে, সন্ধান ক'রে দেখলে বোঝা যাবে, তারো প্রথম আভাস সাহিত্যের, অন্য কথায় মনোজীবনের, নিঃশব্দ শৈল-চূড়ায়। মনোজীবনের সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনের

বিরোধ নেই, বরং জীবনের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে মনোজীবন সুসঙ্গত। কিন্তু মনোজীবন তার স্বতন্ত্রতা বিসর্জ্জন দিতে কখনো রাজী নয়—তার সেই স্বতন্ত্রতার তুঙ্গ শৃঙ্গ হচ্ছে মানব-সমাজে ভাব-তরঙ্গের চিরসহায়।

কিন্তু মনোজীবন শুধু স্বতন্ত্র নয়, সংযুক্তও। যাকে বলা হয় যুগধর্ম্ম, অর্থাৎ বিভিন্ন যুগের বিচিত্র প্রবণতা, তার সঙ্গে তার যোগ অত্যন্ত নিবিড়—এত নিবিড় যে মনোজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যাতে সেই সাহিত্যকে সেজন্যে কেউ কেউ বলতে চান মুখ্যতঃ যুগধর্ম্মী। তাঁদের মতে, সাহিত্য সার্থক হয় যদি যুগধর্ম্ম তাতে ভাষা পায় আর সেইভাবে যুগধর্ম্ম সুসংহতি লাভ করে। এই চিন্তাধারার বশবর্ত্তী হয়েই আমাদের আন্তর্জাতিকতা-বাদীরা বলেন যে একালের যে ধন-সাম্যের বাণী তাকে স্বীকার করলে মানুষের সমাজের যে-রূপ হবে, উচ্চ-নীচ-নির্ব্বিশেষে মানুষ যে আপনার এক অপূর্ব্ব মহিমা উপলব্ধি করবে, সে-প্রেরণার ফলে এক পরম গৌরবময় নূতন সাহিত্যের জন্ম হবে।

যুগধর্ম্মের প্রভাব সাহিত্যের উপরে যে অত্যন্ত বেশী তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। এমন কি, যা যুগধর্ম্মী নয় তা সাহিত্য নয় এই মত যদি কেউ প্রকাশ করেন তবে তার প্রতিবাদ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। দুই একজন সাহিত্যিকের দৃষ্টান্ত অবশ্য আছে যাঁদের সম্বন্ধে একথা যেন খাটতে চায় না। যেমন আমাদের সাহিত্যে মধুসূদন ও ইংরেজী সাহিত্যে কীট্‌স। মধুসূদন লালিত হ'য়েছিলেন "ইয়ং বেঙ্গল" পরিবারে—ফরাসী-বিপ্লবের প্রভাব

যেখানে অনমুভূত ছিল না। কিন্তু সেই মধুসূদন কেমন করে' তাঁর কালের সমস্ত মানসিক দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে অবলীলাক্রমে উপনীত হলেন হোমরীয় যুগে। I hate philosophy in poetry একজন "ইয়ং বেঙ্গল" পরিবারের যুবকের মুখে এ কথা অতি অদ্ভুত। কিন্তু যত অদ্ভুতই হোক বাস্তবিকই মধুসূদন Philosophyর সমস্ত কুটিল-বর্ত্ম অবহেলা করে' আশ্চর্য্য সহজ ভঙ্গিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন আদিম কবির প্রসন্ন রূপ-লোকে! কীট্‌সও তেমনি পরম শান্তিতে ডুবে যেতে পারলেন গ্রীসীয় সৌন্দর্য্য-সাগরে যদিও বিদ্রোহী শেলী আর অশান্ত বায়রণ তাঁর সঙ্গী।—তবে একটু তীক্ষ্ণভাবে দেখলে বোঝা যায় এমন একান্ত রূপ-রসিক মধুসূদন ও কীট্‌সও তাঁদের যুগের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। কীট্‌স কোন্ যুগের লোক তাঁর কাব্যের সঙ্গে তাঁর চিঠিগুলো মিলিয়ে পড়লে তাতে ভুল হয় না। আর মধুসূদনের দেবতাদের প্রতি বিতৃষ্ণা পুরোপুরি হোমরের কাছ থেকে নেওয়া নয়, হিন্দু-কলেজের তরুণ বিদ্রোহীদের যে তিনি অন্যতম এই তত্ত্বও লুকিয়ে রয়েছে ওতে। বাস্তবিক যুগধর্ম্মের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ এমন নিবিড় যে, বলা যায়, যুগধর্ম্ম যেন পাত্র, আর সাহিত্য রস—পাত্রে ভিন্ন রস পরিবেশন অসম্ভব।

সৌভাগ্যক্রমে এই উপমাটির মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে সাহিত্য ও যুগ-ধর্ম্মের সত্যকার যোগের তত্ত্বটি। রস এক বস্তু, পাত্র অন্য বস্তু, তবু এ দুয়ের মধ্যে একান্ত যোগ। তেমনি সাহিত্যের

যা প্রাণবস্তু একান্তভাবে তা যুগধর্ম্মের ব্যাপার নয়, তবু সেই প্রাণবস্তু নিজেকে প্রকাশ করে যুগধর্ম্মের পরিচ্ছদে। আর একটি উপমা দেওয়া যায়, সেটি এর চাইতেও ভাল—সাহিত্য ফুল আর যুগধর্ম্ম তার বৃন্ত। পাত্রের সঙ্গে রসের যা সম্পর্ক ফুলের সঙ্গে বৃন্তের সম্পর্ক তার চাইতে নিবিড়তর—অঙ্গাঙ্গী। তবু বৃন্ত আর ফুল ঠিক এক জিনিস নয়। ফুলকে বৃন্ত ধারণ করেছে—সেটি বৃন্তের সৌভাগ্য, ফুলেরও শোভা।

সাহিত্য আর যুগধর্ম্ম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়েও কেমন করে' পৃথক, সে কথাটি বুঝতে হলে সাহিত্য-সৃষ্টির গোড়ার ব্যাপারে মন দিতে হয়। সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে অনুভূতির গভীরতা যার সঙ্গে ভাষা-শক্তির যোগ হয়েছে। সেই অনুভূতির গভীরতা কোনো যুগধর্ম্মের ব্যাপার নয়, মানব-মনের চিরন্তন ব্যাপার—যুগের কোনো বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ হয়ে সেই গভীর অনুভূতি জাগিয়েছে—অথবা কোনো যুগের বিশেষ ঘটনা আশ্রয় করে' সেই অনুভূতি জেগেছে। এ দুয়ের শেষের কথাটি ভাল; অনুভূতির গভীরতা থেকেই যে সাহিত্য উৎসারিত হয় সেই উৎসারিত হওয়ার ভঙ্গিমাটি এতে আছে।

যুগধর্ম্মের সঙ্গে সাহিত্যের এমন যোগ বলে'ই একালের যে যুগধর্ম্ম তা যে সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করবে, এ অত্যন্ত স্বাভাবিক। হচ্ছেও তাই। একালের প্রত্যেক বড় সাহিত্যিকের রচনার উপরে বিজ্ঞানের প্রভাব যেমন পড়ছে তেমনিভাবে পড়ছে গণতন্ত্র ও ধনসাম্য-তত্ত্বের প্রভাব।

বাংলা সাহিত্যও যে সেদিকে যাবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। বরং না গেলেই আশ্চর্য্যের বিষয় হবে। তবু বুঝবার আছে যে, যুগধর্ম্ম যত প্রবল, যত মহান্ হোক সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যাপারে তা উপলক্ষ। সাহিত্য জ্ঞান মাত্র নয়, কল্যাণ-বুদ্ধি মাত্র নয়, সাহিত্য জ্ঞান-কল্যাণ-আনন্দ-ঘন মূর্ত্তি—সাহিত্য ব্যক্তিত্বের পরম দান। মনোজীবনের উপরে জোর সেইজন্য দিতে হয়।

আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। আমাদের এ-কালের সাহিত্যে যে শ্রীহীনতা দেখা দিয়েছে সেটি একটি তুচ্ছ সাময়িক ব্যাপার নয়, তার মূল কারণ আমাদের চিৎ-শক্তির দৈন্য, এই কথা বলতে চেষ্টা করেছি। আমাদের সেই দৈন্য দূর করে' সুস্থ ও সবল মানসিকতা লাভের একটি সুযোগ আমাদের ঘটেছিল কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করা হয়নি—একথাও উঠেছে। সমস্যাটিকে এই দিক দিয়ে দেখেছি বলে আমাদের সাহিত্যের প্রচলিত সমস্যাগুলোর দিকে তাকাবার সুযোগ হয় নি। আমাদের সাহিত্যের, তথা জীবনের, যে-সঙ্কটের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি সেটি বাস্তবিকই একটি সঙ্কট, না আপনাদের স্বস্তিহীন করবার ফন্দি মাত্র—সে-বিচারের ভার আপনাদের হাতে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন—সাহিত্য-শাখা—
দ্বাবিংশ অধিবেশন,
এপ্রিল, ১৯৩৯

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব

ধর্ম্ম বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক মতপরিবর্ত্তন ঘটে। শোনা যায় প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন নাস্তিক। কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে নাস্তিক্য তিনি বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় —তাঁর পরমপ্রিয় হিন্দুত্বের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও তাঁর মতের পরিবর্ত্তন হয়। তাঁর কোনো কোনো রচনা এখনো অপ্রকাশিত বা অপ্রচলিত। তাঁর মনোজীবনের পর্য্যাপ্ত পরিচয় লাভের পথে সেটিও এক বড় বাধা। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম-জীবন সম্বন্ধে তেমন নয় তাঁর "ধর্ম্মতত্ত্ব" গ্রন্থখানি সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলতে চেষ্টা করব।

এই ধর্ম্মতত্ত্ব বইখানি পড়তে বসে প্রথমেই চোখে পড়ে জীবনের ব্যাপকতার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি। তাঁর বহু পূর্ব্বে রামমোহন বলেছিলেন, "ধর্ম্ম যদি ঈশ্বরের রাজনীতি তবে কি শয়তানের?" তাঁর পরবর্ত্তী চিন্তা ও কর্ম্ম-নায়করা জীবনের ব্যাপকতা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণার পরিচয় মাঝে মাঝে দিয়েছেন; তাঁদের কারো কারো অনুভূতির সূক্ষ্মতা পরম প্রশংসার্হ; কিন্তু জীবনের ব্যাপকতা সম্বন্ধে চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থে যেমন পরিচ্ছন্ন রূপ লাভ করেছে তা সে-যুগে অনন্যসাধারণ।

এ তর্ক উঠতে পারে যে ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র যে চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে মৌলিকতা কম। উনবিংশ

শতাব্দীর অনেক ইয়োরোপীয় পণ্ডিতের প্রভাব যে তাঁর উপরে পড়েছিল তার উল্লেখ তাঁর গ্রন্থেই রয়েছে। তাঁর সমসাময়িক দেশীয় যে সব পণ্ডিতের প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যাঁর নাম তিনি হচ্ছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী রামমোহনের চিন্তার প্রভাবও যে তাঁর উপরে কম নয় সে কথার উল্লেখ তাঁর অন্য একটি রচনায় তিনি নিজেই করেছেন। এ সব মিথ্যা নয়। কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে মৌলিকতার অর্থ যদি শুধু নব-উদ্‌ভাবনা না হয়ে নব-উপলব্ধিও হয় তবে ধর্ম্মতত্ত্বের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র মৌলিকতার অধিকারী।—তাঁর সেই নব-উপলব্ধি কি ?

এ প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহ, তাঁদের মতে—বঙ্কিমচন্দ্রের এই নব-উপলব্ধির নাম নব-হিন্দুত্ব।—তাঁদের এই মতের সমর্থন বঙ্কিমসাহিত্যে প্রচুরভাবে বিদ্যমান। কিন্তু অপর একটি ব্যাপারও বঙ্কিম-সাহিত্যে আছে, তার নাম নব-জাতীয়তা-বোধ—তার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের নব-হিন্দুত্ব-বোধের সঙ্গতি কোথায় সে-সম্বন্ধে অকুণ্ঠিত আলোচনায় এঁরা তেমন উৎসাহী নন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত-পরিবর্ত্তনের আধিক্য অথবা চিন্তার বিশালতা ও জটিলতা যে তাঁকে বুঝবার পথে এক বড় বাধা তা স্বীকার করেও বলতে হবে, তাঁর এই শ্রেণীর পাঠকদের এই অনিশ্চয়তা প্রশংসার্হ নয়।

আমাদের মনে হয়, ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার যে মৌলিকতা প্রকাশ পেয়েছে তার নাম নব-হিন্দুত্ব না দিয়ে

তাঁর স্বদেশবাসীদের জন্য নব মানবতা-বোধ বা নব জাতীয়তা-বোধ দেওয়াই সঙ্গত। এর সপক্ষে আমাদের যুক্তির ধারা সংক্ষেপতঃ এই :—প্রথমেই স্মরণীয় ধর্ম্ম-বোধের জাগরণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিখ্যাত উক্তি……"এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়? সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি, যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছি, এই পরিশ্রম, এই কষ্ট-ভোগের ফলে এইটুকু বুঝিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি এবং সে ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।" এখানে দেখা যাচ্ছে ধর্ম্ম-বোধের বা ঈশ্বর-বোধের অধীন হয়েই বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় মনো-নিবেশ করেছেন। কিন্তু ঈশ্বর-ভক্তি তাঁর যত প্রিয়ই হোক তাঁর মানসিক প্রবণতা যে ভক্তের তেমন নয় যেমন দেশের বা জাতির পথ-নির্দ্দেশকের তা বোঝা যায় তাঁর সমসাময়িক কেশব-চন্দ্রের "জীবন-বেদে"র সঙ্গে তাঁর "ধর্ম্মতত্ত্বে"র তুলনা করলে। "জীবন-বেদে"র বক্তাও গুরুর আসনে উপবিষ্ট। কিন্তু গুরুর গৌরব অতিক্রম করে' উল্লসিত হয়েছে তাঁর ভক্তি বা ঈশ্বর-

যোগ। কিন্তু গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে নিবদ্ধ জীবনের দৈনন্দিন দায়িত্বের দিকে ও তাঁর শিষ্যের ক্ষমতা-অক্ষমতার দিকে।

ভক্তি-ধর্ম্ম আমাদের দেশে সুবিদিত। আমাদের দেশের লোকদের বহু তাপে তাপিত জীবন কয়েক শতাব্দী ধরে স্নিগ্ধ হয়ে আসছে এই রসের অভিষেকে। এ-কালের বাঙালী-সমাজে বিদ্রোহী কেশবচন্দ্রের অপূর্ব্ব জনপ্রিয়তার হেতুও এই ভক্তি-তন্ময়তা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তি-বাদের অথবা জীবন-বাদের মাহাত্ম্য এইখানে যে তা আমাদের দেশে নূতন—দৈনন্দিন জাগতিক জীবন কত মহিমমণ্ডিত হতে পারে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসমঞ্জসীভূত হয়ে সে-মন্ত্রের এক অমোঘ নির্দ্দেশ দেশ পেল এই শক্তিমান জিজ্ঞাসুর কণ্ঠে। "সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশ-প্রীতি" তাঁর এই মন্ত্র এ-দেশের লোকদের কানে যেমন চমকপ্রদ তেমনি অর্থপূর্ণ—তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতা ও উপদেশ যেন গাঁথা হয়ে গেল এই সূত্রে।

বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুত্বও তাঁর সাহিত্যের পাঠকদের বিশেষ জিজ্ঞাসার বিষয় হওয়া উচিত। আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয়, এ সম্বন্ধে তিনি নিজে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেন নি। পারা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না এই কারণে যে প্রাচীন ধর্ম্মের অনুবর্ত্তনের সঙ্গে যার বড় রকমের বিরোধ সেই বৈজ্ঞানিকতার প্রতি তাঁর প্রকৃতিগত শ্রদ্ধা অপরিসীম। সেই শ্রদ্ধাকে ঈশ্বর-ভক্তির অতলে ডুবিয়ে দেবার আগ্রহ তাঁতে

মাঝে মাঝে জাগা বিচিত্র নয়—অনেক জ্ঞানবীরের অন্তরে এমন আকুলতা জেগেছে—কিন্তু তাঁর স্বধর্ম্ম যে মানসিক সচেতনতা ও মানব-প্রীতি তা পরিম্লান হয় নি কোনোদিন—এই মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে মূলতঃ জ্ঞানব্রতী মানব-বন্ধু, এই দিক্ থেকে দেখে বলা যায়, তাঁর হিন্দুত্ব তাঁর মানবত্ব-বোধের একটি নাম মাত্র। "হিন্দুধর্ম্ম মানি হিন্দুধর্ম্মের বকামিগুলা মানি না"—তাঁর এই উক্তিও এই সম্পর্কে স্মরণীয়। গীতার মাহাত্ম্যের কাছে বেদ তাঁর কাছে যে নগণ্য মনে হয়েছে এর মধ্যেও রয়েছে তাঁর হিন্দুত্বের পরিচয়।

তবু সুপরিচিত প্রাচীন শব্দ তিনি যে নূতন অর্থে ব্যবহার করেছেন এটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর একটি অপরাধ বলেই কেউ কেউ ধারণা করতে পারেন। এই কঠোর সমালোচকদের সামনে মাত্র এই কথাটি উপস্থিত করা যেতে পারে যে চিন্তাশীলদের মধ্যে যাঁরা কবি, অর্থাৎ কল্পনাকুশলী, প্রাচীন শব্দ এমন নূতন অর্থে ব্যবহারের দিকে তাঁদের প্রবণতা প্রায় দুর্নিবার। তাতে গণ্ডগোল কিছু হয়, কিন্তু কাজও কম হয় না। "সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশ-প্রীতি"—বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাণী যে এক সময়ে নব-চেতনার বিদ্যুৎ সঞ্চার করতে পেরেছিল দেশের জড়চিত্তে, অনেকের মতে, তার গূঢ় কারণ, সেদিনে এর মুখে ছিল নব-হিন্দুত্বের মোহন গুণ্ঠন।

কিন্তু এই বাণীর এই মোহিনী-রূপ একদিন যত অর্থপূর্ণই হোক আজ প্রয়োজন দেশের বৃহৎ চিত্ত-ক্ষেত্রে এর পূর্ণ কল্যাণী-

রূপের প্রতিষ্ঠা। নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে তার আয়োজনও চলেছে দেশের সর্ব্বত্র। এই দিনে বিশেষভাবে স্মরণীয় ভাবুক-বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক মর্য্যাদা—কুঁড়ি যে ফুল হয়, তরুণী যে জননী হয়, সেই কথা। এই স্বপ্ন-বিলাসের দেশে নব মানবতা-বোধের ও নব জাতীয়তা-বোধের ভিত্তি রচনায় যিনি সামান্য সাহায্যও করতে পারবেন, তাঁর মর্য্যাদা অসামান্য।

১৩৪৬

ফেরদৌসী-উৎসব

মহাকবি ফেরদৌসীর সহস্রতম-জন্ম-বার্ষিকী তাঁর স্বদেশবাসীরা সম্প্রতি মহাগৌরবে সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের সেই উন্মাদনার ঢেউ দূরদূরান্তের জনচিত্ততটে প্রহত হয়েছে। ঢাকার "মুসলীম সাহিত্য-সমাজে"র ফেরদৌসী-উৎসবকে যদি কেউ ভাবেন বহু দেশের সেই আনন্দ-কোলাহলের প্রতিধ্বনি, তবে তাঁর ভুল করবার সম্ভাবনা কম।—আনন্দের সামনে আনন্দ ত চিরশোভন।

মহাকবির জন্মে আরো কয়েকটি দেশ ধন্য হয়েছে। কিন্তু মহাকবিদের মধ্যেও ফেরদৌসী এক বিশেষ ভাগ্যবান পুরুষ। এমন সাহিত্য-রসিক আছেন যাঁদের চোখে ফেরদৌসীর প্রতিভার গৌরব কম নয় কিন্তু হোমর বা দান্তের কবি-প্রতিভার গৌরব তার চাইতে কিছু বেশী। ভারতে ব্যাস-বাল্মিকীর জনপ্রিয়তাও অশেষ। তবু যখন ভাবা যায়, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একটি পর্য্যুদস্ত জাতির নব-সৌভাগ্য-সূর্য্যরূপে অভিনন্দিত হয়েছিলেন এই ফেরদৌসী, ইনিই আবার হয়েছেন সেই জাতির দীর্ঘ অবসাদের শেষে নব জীবনারম্ভের অবলম্বন—তখন বোঝা যায় এমন সার্থক প্রতিভা জগতে কত বিরল।

ফেরদৌসীর কবিপ্রতিভার এই অপূর্ব্ব সার্থকতার কথা ভাবতে গিয়ে মনে হয়েছে, এর বড় কারণ তাঁর ভিতরকার যৌবন-ধর্ম্ম—যে যৌবন পর্ব্বতের মতো দৃঢ়মূল ও অভ্রংলিহ,

অগ্নির মতো প্রোজ্জ্বল, অথচ আত্মবোধ ও আত্ম-বিলোপ একই সঙ্গে যে-যৌবনে সম্ভবপর হয়েছে। শাহ্‌নামার বীর সম্রাট বাহ্‌রামকে তাঁর অনুবর্ত্তীরা বলছেন—"তুমি যখন তীর তলোয়ার ও যুদ্ধকুঠারে সজ্জিত হও তখন তোমার সেই মহিমময় মূর্ত্তি দেখে তোমার সেনানীবৃন্দ বিহ্বল হয়, তাদের হাতের তীর ধনুক খসে পড়ে"; তার উত্তরে বাহ্‌রাম বলছেন—"কিন্তু সেই শক্তির উৎস ঈশ্বর, তিনি যদি এ শক্তি প্রত্যাহার করেন তবে বাহ্‌রামের কি আর থাকে।"

একই সঙ্গে এই আত্মবোধ ও আত্মবিসর্জ্জনের ক্ষমতার জন্যই তিনি হয়েছেন অতি সহজ মানুষ, মানুষের পরম আপনার জন। মুখ্যতঃ এরই জন্য যে ধর্ম্ম তাঁর দেশবাসীরা বিদেশী আরবদের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন তার ভিতরকার যা চিরন্তন তা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে তাঁর ভিতরে দ্বিধা জাগে নাই, অথচ তাঁর ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী পূর্ব্বপুরুষদের মাহাত্ম্যও তাঁর মতো তাঁর অন্য কোনো দেশবাসীর চোখে প্রতিভাত হয় নাই। তাঁর সাহচর্য্য তাই সহজেই হয়েছিল তাঁর দেশবাসীদের জন্য সর্ব্ব-প্রকারে স্বাস্থ্যপ্রদ—জাতীয় দুর্গতির হাত থেকে মুক্তি তাঁরা লাভ করেছিলেন অবলীলাক্রমে।

কবিদের সবাইকে বলা হয় চিরযুবা, কিন্তু ফেরদৌসীকে বলতে ইচ্ছা হয় চিরনবীন—সে-নবীনতায় প্রাত্যহিক জীবনের মালিন্যের স্পর্শ যেন লাগে নাই যদিও এই কবির জীবন অতিবাহিত হয়েছিল নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়ে।

এই নবীনতা একদিকে যেমন অপূর্ব্ব তেজে প্রদীপ্ত, অন্যদিকে তেমনি সৌন্দর্য্যের সামনে চির-প্রসন্ন-দৃষ্টি জ্ঞানের সামনে চির-শ্রদ্ধাবান্। পারশ্য-সাহিত্যে জ্ঞানবত্তায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন বোধ হয় সাদীর। তাঁর প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এই কবি সেই ক্ষেত্রে তাঁর পথ-প্রদর্শক।

এই ফেরদৌসীকে আজ আমরা, একালের বাঙালী, স্মরণ করছি পরম আনন্দে ও কিঞ্চিৎ বেদনায়। আমাদের জীবন আজ দ্বিধান্বিত—বিপর্য্যস্ত। হে সহজ মানুষ, তোমার সহজ মানবতার দীপ্তি আমাদের মর্ম্মমূলে সঞ্চারিত হোক—সর্ব্ব-দ্বিধা-মুক্ত হয়ে আমরা সৃষ্টিধর্ম্মী হব। হে চির-আয়ুষ্মান্, তুমি জয়ী হও।

১৩৪১

ভারতের জাতীয় আদর্শ

·········পূজার সংখ্যার জন্যে সম্পাদকের কড়া তাগিদ এসেছে। কি লিখব ভাবছি।

স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের একখানি রিপোর্ট সামনে এসে পড়লো, তার ললাটে স্বামী বিবেকানন্দের এই লিপি—The national ideals of India are Renunciation and Service. Intensify her in these channels and the rest will take care of itself. কথাটা নতুন নয়। এর আলোচনাও নতুন নয়। তবু মনে হচ্ছে, এসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা যেতে পারে।

"ত্যাগ ও সেবা ভারতের জাতীয় আদর্শ"—এর প্রতিবাদ করে কেউ যদি বলেন "ভোগ ও প্রভুত্ব ভারতের জাতীয় আদর্শ হওয়া উচিত", তবে শ্রোতারা চঞ্চল হয়ে উঠবেন, এমন দিন আর নেই বলে মনে হয়। যাঁরা এই ত্যাগ ও সেবার আদর্শের পূজারী বলে' নিজেদের জানতেন, তাঁরা ব্যর্থতা এতখানি ভোগ করেছেন যে তাঁদের অবস্থাকে আজ শোচনীয় আখ্যা দেওয়া যেতে পারে—সকল দুর্দ্দশার বড় দুর্দ্দশা যে লক্ষ্য-ভ্রংশ ও আশাহীনতা, তার অতি নিকটবর্ত্তী তাঁরা হয়েছেন। বাদ-প্রতিবাদের তীব্র আনন্দের প্রলোভন আজ তাই পরিত্যাজ্য।

ত্যাগ ও সেবার আদর্শ—শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা সভ্য জগতে একদিন এর প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। কোনো মানব-সমাজ কোনো কালে ব্যাপকভাবে এ আদর্শ অনুসরণ করেছিল কি না সে-তর্ক এড়িয়েও বলা যায়—এ আদর্শের প্রভাবে অনেক মহিমময় ব্যক্তির অভ্যুদয় জগতে ঘটেছে, যাঁরা ত্যাগ ও সেবার আদর্শের একান্ত বিরোধী দেশ-দেশান্তরের সেই নিট্‌শে-গোত্রের লোকেরাও এঁদের ব্যক্তিত্বের প্রতি কম শ্রদ্ধান্বিত নন।

কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সুফল যাই-ই ফলাক, সমষ্টিগত জীবনে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ কোনো কালে জগৎ যে সর্ব্বান্তকরণে গ্রহণ করেনি, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বৌদ্ধ-সঙ্ঘ আর খৃষ্টীয় সঙ্ঘের ইতিহাসে রয়েছে এর অদ্ভুত প্রমাণ। ভারত ত্যাগ আর সেবার তীর্থক্ষেত্র—এই বহুলপ্রচলিত মতও বিচারসহ নয়। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে রয়েছে এর প্রতিবাদ —ত্যাগ ও সেবার আদর্শের চাইতে ভোগ ও বলদর্পিতার ছবি সেখানে স্পষ্টতর হয়ে ফুটেছে। ভারতীয়-মানব-জীবনের ধারা যে মানবতার সাধারণ ধারার সঙ্গে তুলনায় অসাধারণ বা অদ্ভুত কিছু নয়, অন্ততঃ অসাধারণত্ব বা অদ্ভুতত্ব যা চোখে পড়ে তা তার গৌরবের বিষয় নয়, হয়ত লজ্জার বিষয়—অথবা শঙ্কার বিষয়—একথা ভাববার দিন এসেছে।

ত্যাগ ও সেবার আদর্শ ব্যক্তিগত জীবনে কার্য্যকরী সমষ্টিগত জীবনে নয় এই সিদ্ধান্তও স্থূল। ব্যক্তি ও সংহতির মধ্যে পার্থক্য

এতখানি, একথা একালের চিন্তার সমর্থন পাবে না। বরং ব্যক্তি সংহতির একটি অংশ, সংহতির দ্বারা বহুলপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত—এই মতই আজ শ্রদ্ধার দাবী জানায়। ত্যাগ ও সেবার আদর্শ যদি সমষ্টিগত জীবনে গ্রহণীয় না হয়, তবে ব্যক্তিগত জীবনেও তা প্রকৃতই গ্রহণীয় নয়। ত্যাগ ও সেবার আদর্শ যে ব্যক্তিগত জীবনে কার্য্যকরী, একথা পরীক্ষা-সাপেক্ষ।

ত্যাগ ও সেবার কথা উঠলে সহজেই মনে ভেসে ওঠে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। এই সুস্থ ও স্বস্থ মূর্ত্তির প্রতি অশ্রদ্ধার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যেন অসম্ভব। কিন্তু বুদ্ধদেবের আদর্শকে কেন ত্যাগের আদর্শ বলা হবে? জীবন দুঃখময়, সেই দুঃখ কেমন করে জয় করা যায়, সেই সাধনা বুদ্ধদেবের। কামনার উন্মার্গগামিতাকে জ্ঞান-বল্গার সাহায্যে আয়ত্ত করে জীবনের সেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা তিনি করলেন। লোকসংখ্যা তখন আজকার তুলনায় মুষ্টিমেয়—সে-ব্যাপারটি হয়েছিল তাঁর এই ব্যক্তি-কেন্দ্র সিদ্ধান্তের অনুকূল। কিন্তু এ-কে ত্যাগের আদর্শ নাম দিয়ে ধন-সম্পদের প্রতি মানুষের প্রতিদিনের লোভকেই অত্যন্ত বড় করে দেখা হয়েছে। দূরের যাত্রী যে, গাঁঠরিবোচ্‌কার মায়া তাকে অনেক পরিমাণে কাটাতে হয়; গাছে যখন নতুন পাতা গজাবার সময় হয়, পুরোনো পাতা তখন আপনি ঝরে পড়ে,—এসব কি ত্যাগ? স্বামী বিবেকানন্দ যে তাঁর কালের গ্রাজুয়েটদের জন্য সহজলভ্য ডেপুটিগিরি পরিত্যাগ করে জ্ঞান ও প্রেমের জীবন গ্রহণ করেছিলেন, এটিও ত্যাগের দৃষ্টান্ত নয়—

জীবনকে পূর্ণতালাভের পথে পরিচালনার দৃষ্টান্ত। জগতের বুদ্ধদের আর ঘিউ-আটার সেবাইৎ মহারাজদের মধ্যে যে পার্থক্য, তাতে ভুল হওয়া বিপজ্জনক। বুদ্ধরা মূলতঃ জীবন-কারখানার কর্ম্মী—দণ্ড-কমণ্ডলু তাদের জন্য একটা সৌখীনতা। ত্যাগ ঋণাত্মক, কিন্তু জীবন ধনাত্মক। ত্যাগ কথাটার এত অর্থহীন ব্যবহার দীর্ঘকাল ধরে হয়েছে যে, ওটির সম্বন্ধে শঙ্কিত হবার প্রয়োজন হয়েছে। ত্যাগ কথাটার সঙ্গে ভারতের কয়েক শতাব্দী ব্যাপী ব্যর্থতার কান্নার সুর নিবিড়ভাবে জড়িত।

ত্যাগ জীবনের ধর্ম্ম নয়—জীবনের ধর্ম্ম সংগ্রহ, পরিপাক, বিকাশ। তাছাড়া মানব-জীবন যে বিশেষভাবে সমাজধর্ম্মী একথাটা এ যুগের মানুষ আগেকার চাইতে অনেক বেশী স্পষ্ট করে' বুঝেছে। সেজন্যে এ যুগের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—জীবনের অর্থ সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত উভয়তঃ সংগ্রহ, পরিপাক, বিকাশ। বার্ণার্ড শ'র এই কথাটা এ যুগে মহামূল্য—Let us live rationally and nationally—বিচার-বুদ্ধি আর জাতীয়তা-বোধ আমাদের অবলম্বন হোক। বিচার-বুদ্ধি আর জাতীয়তা-বোধ উভয়কেই যখন জীবনের ভিত্তি জ্ঞান করা হলো, তখন আন্তর্জাতিকতার কথা আর অকথিত রইল না। তবে মানুষের সভ্যতা এখনো যে স্তরে তাতে জাতীয়তাকেই আজো তার দৈনন্দিন জীবনের পটভূমিকা জ্ঞান না করে উপায় নেই।

আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর ভাবুকদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য-বাদ একটি স্বপ্নসাধ। সেই স্বপ্নের মোহ আজো যদি আমাদের না

কেটে থাকে, তবে সেটি আমাদের অপরাধ—আমাদের অহঙ্কারের বিষয় নয়। সেকালের আত্মজয়ের আদর্শ একালে গৌরবান্বিত হয়েছে প্রকৃতি-জয় ও রাষ্ট্র-গঠনের আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়ে—আর এই যোগ অঙ্গাঙ্গী।

১৩৪৬

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব

সম্প্রতি কংগ্রেসনেতা মহাত্মা গান্ধী মুস্‌লীম-লীগ-নেতা মিষ্টার জিন্নাহ্‌ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যে কয়েকটি কথা বলেছেন তা শুধু রাজনীতিজ্ঞদের ভাবনার বিষয় নয়।

কংগ্রেস ও মুস্‌লীম লীগের মধ্যে কিছুকাল ধরে তীব্র বিরোধিতা চলেছে, এর ফলে এই দুই দলের লোক পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়েছে, একথা বলা যায়। এমন অবস্থায় যখন মহাত্মা গান্ধী বল্‌লেন—(১)

মুসলিম লীগ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এর সভাপতি এক সময়ে ছিলেন একজন উদ্যোগী কংগ্রেসসেবী। তিনি কংগ্রেসের আশা-ভরসার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। লর্ড উইলিংডনের সঙ্গে তাঁর সংগ্রামের কথা ভুলবার নয়।......লীগের এমন বহু সভ্য আছেন স্মরণীয় খেলাফত যুগে যাঁরা ছিলেন মনে প্রাণে কংগ্রেসের সমর্থক। আমি মান্‌তে প্রস্তুত নই যে এই অল্প কিছু কাল পূর্ব্বের সহকর্ম্মীরা পরস্পরের প্রতি অন্তরে ততখানি অকরুণ হতে পারেন যতখানি অকরুণতা তাঁদের বক্তৃতায় ও লেখায় প্রকাশ পাচ্ছে।

---

(১) "The Moslem League is a great organisation. Its president was at one time an ardent Congressman. He was the rising hope of the Congress. His battles with Lord Willingdon cannot be forgotten....................The League contains many members who were whole-heartedly with the Congress during the memorable Khilafat days. I refuse to think that these erstwhile Comrades can be as bitter in their hearts towards their fellow workers of yesterday as their speeches and writings would show.

তখন যুদ্ধরত এই দুই দলের অনেকের মনে যে চমক লেগেছিল তা বোঝা সহজ।

কিন্তু এই উক্তি শুধু চমকপ্রদ নয়, এর মধ্যে রয়েছে সত্যের গূঢ় উপলব্ধির পরিচয়। বর্ত্তমান আমাদের জন্য প্রবল-প্রতাপ। তার দৌরাত্ম্যে আমরা ভুলে যাই অতীতের ধারা, ভুলে যাই ভবিষ্যতের সার্থকতার কথা—যেমন সামনের একটি ক্ষুদ্র প্রদীপ আমাদের জন্য ব্যর্থ করতে পারে আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না। কিন্তু প্রবল স্রোতে ভাসতে ভাসতেও যেমন সম্ভব কোন দিকে যেতে হচ্ছে সে-সম্বন্ধে কিছু হুশিয়ার হওয়া, বর্ত্তমানের প্রবল প্রভাবও তেমনি সময় সময় অতিক্রান্ত হতে পারে। বর্ত্তমানে কংগ্রেসের শত্রুস্থানীয় মুসলীম লীগের প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা জানিয়ে মহাত্মা গান্ধী দেশের ভবিষ্যৎ সার্থকতার দিকে একটি অবিচলিত সত্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পেরেছেন। যা ঘটছে তার চাইতেও যা ঘটা উচিত সে-সম্বন্ধে বোধ মানুষের কর্ম্মশক্তির সহায়তা করে বেশী। যারা আমাদের শত্রু তারা সত্যের শত্রু নাও হতে পারে, এ চেতনা আমাদের মধ্যে এত বিরল যে কোথাও এর পরিচয় পেলে সত্যই উৎফুল্ল হবার কারণ ঘটে। ইংরেজের রাজনীতি এই দিক দিয়ে খুব অগ্রসর, সেখানে বিরুদ্ধপক্ষকে বলা হয় His Majesty's Opposition অর্থাৎ দেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে অন্য একটি শ্রদ্ধেয় মত। মহাত্মা গান্ধীর এই মনোভাব ভারতীয় রাজনীতিতে যুগান্তর সূচনা করবে যদি এটি দেশের সর্ব্ব দলের রাজনৈতিক কর্ম্মীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে।

কিন্তু এমন একটি অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের হিন্দু ও মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর যোগ সম্পর্কে যে কথা তিনি বলেছেন নানা কারণে তা শোচনীয়—অন্ততঃ আনন্দকর নয়। তিনি অহিংসার পূজারী। অহিংসাই যে মানুষের জন্য পরম সত্য এ সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ। তিনি তেম্‌নি নিঃসন্দেহ এ সম্বন্ধে যে এটি হিন্দু-চিন্তার মর্ম্মকথা। কিন্তু এটি মুসলমান-চিন্তার মর্ম্মকথা কি না সে-সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ নন। তাঁর অনেক মুসলমান সহকর্ম্মীর অহিংসা-প্রীতি তাঁর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। তাঁর নিজের মনেও যে এমন একটি বিশ্বাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে যেহেতু কোর্‌আন একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ সেজন্যে হিংসার চাইতে অহিংসার দিকেই এর সত্যকার প্রবণতা, এমন ধারণা করবার সঙ্গত কারণ রয়েছে। তবু সে-কথা সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে তিনি প্রকাশ করতে পারছেন না। মুসলমান-শাস্ত্র-সম্বন্ধে সত্য-নির্ণয়ের ভার তিনি তাঁর মুসলমান বন্ধুদের উপরে দিয়ে ক্ষান্ত হতে চান। তাঁর উক্তিটি এই—(২)

মুসলমান বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা আমার কাছে অনেক কিছু আশা করেন এইবার তাঁরা হয়ত উপলব্ধি করবেন শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার জন্য আমার মর্ম্ম-বেদনা যদিও এই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তপস্যায় আমি ত্রুটি করিনি। তাঁদের আরো বোঝা উচিত যে আমার প্রধান কাজ

(২) Moslem friends who hope much from me will perhaps now recognize my agony for the unattainment of peace inspite of the travail that I have gone through. They should also see that my principal work lies through teaching at least Hindus to

হচ্ছে অন্ততঃ হিন্দুদের অহিংসা-নীতিতে পারদর্শী করে তোলা যতদিন না মুসলমানদের মনোভাব হয় খেলাফত যুগের আলি ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁদের সঙ্গীদের মনোভাব। তাঁরা বলতেন—আমাদের হিন্দু-ভায়েরা যদি আমাদের কেটে টুক্‌রো টুক্‌রোও করে তবু আমরা তাদের ভালবাসব। তারা আমাদের আপনার জন—রক্তের রক্ত।

মহাত্মা গান্ধীর এই মনোভাবকে কেন শোচনীয় বলতে সাহস করেছি সংক্ষেপে তা বলা যায় এই ভাবে:—নেতা কে? যিনি সমসাময়িক জগতের সঙ্গে ও বিশেষভাবে তাঁর জাতির সঙ্গে নিবিড় যোগে যুক্ত—সেই যোগ তাঁকে শক্তি দেয় জাতির মর্ম্ম-বেদনা বুঝতে ও তার প্রতীকারে ব্রতী হতে। মহাত্মা গান্ধী যে এই ধরণের একজন নেতা তা নিঃসন্দেহ। তাঁর দেশবাসীর দারিদ্র্য ও কাপুরুষতা আর বৃহত্তর জগতে শক্তির অপব্যবহার দুয়েরই বেদনা সুগভীর তাঁর মনে, আর সেই বেদনা থেকে জন্মলাভ করেছে তাঁর অহিংসা ও সত্যাগ্রহ। এ দুয়ের মধ্যে তাঁর দেশ-বাসীর পক্ষপাত সত্যাগ্রহের দিকে আর তাঁর নিজের পক্ষপাত অহিংসার দিকে। অহিংসাই তাঁর মতে সত্যাগ্রহের মূল। শুধু ব্যক্তিগত ভাবে নয় সমষ্টিগত ভাবে এই অহিংসা সাধনে যদি তিনি সফলকাম হন তবে মানুষের সভ্যতার সমৃদ্ধিসাধন

---

learn the art of non-violence until it can b ing the Moslems to the position the Ali Brothers and their associates took up during the Khilafat days. They used to say, "Even if our Hindu brethren cut us to pieces yet will we love them. They are our kith and kin."

হবে, এই বিশ্বাসের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত। কিন্তু এজন্য ধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে তাঁর চারপাশের সবাইকে না ডেকে শুধু হিন্দুকে তিনি যে ডাকছেন এতে তাঁর সাধনা বিঘ্ন-সঙ্কুল হলো বেশী কেননা পূর্ণ সত্যাশ্রয়িতার উপরে তার অধিষ্ঠান হলো না। হিন্দু কে, আর মুসলমান কে, এ সম্বন্ধে ভুল হবার সম্ভাবনা আজ নেই, বিরোধিতা তাদের মধ্যে আজ এমনই তীব্র হয়েছে। কিন্তু তবু কোনো সত্যকার কাজে তাদের বাস্তবিকই বিভিন্ন জ্ঞান করা যায় কি? যায় না এই মূল কারণে যে তাদের জীবনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি এক। এমন দিন ছিল যখন ধর্ম্ম মানুষের পরকাল ও ইহকাল উভয়েরই কাণ্ডারী ছিল; সেদিন ধর্ম্ম স্বরাট্ ছিল। কিন্তু আজ ধর্ম্ম তার সেই অধিকার হারিয়াছে, হারিয়ে মুখ্যতঃ কাব্য-সৌন্দর্য্যের বিষয়ীভূত হয়েছে। ধর্ম্মের এই পরিবর্ত্তিত স্বরূপের দিকে আমাদের দৃষ্টি অত্যন্ত কম বলেই ধর্ম্ম নিয়ে এত অনর্থ সম্ভবপর হচ্ছে। যদি বলা যায়, মহাত্মা গান্ধী তাঁর অহিংসা-মন্ত্রের সাধনের জন্য আহ্বান করেছেন সবাইকেই তবে অহিংসার সঙ্গে হিন্দুর পরিচয় ঘনিষ্ঠতর বলে হিন্দুকেই তিনি বিশেষভাবে আহ্বান করেছেন, তবে শক্ত প্রশ্ন এই দাঁড়ায়—সত্যই কি অহিংসার সঙ্গে হিন্দুর ঘনিষ্ঠতর পরিচয়? বৌদ্ধ যুগের অহিংসাকে সহজেই গ্রহণ করা যেতে পারে সেদিনের ভারতীয় চিত্তোৎকর্ষের একটি পরিচয় বলে; কিন্তু মধ্যযুগের বৈষ্ণব অহিংসা সম্বন্ধে সেকথা খাটে না। মুসলিম-বিজয়ের সমসাময়িক সেই অহিংসার সঙ্গে

নিবিড় ভাবে যে মিশে রয়েছে পরাভবের সান্ত্বনা সে-সম্বন্ধে সচেতন না হলে ভাববিলাসিতার পরিচয় দেওয়া হয় অনেক বেশী। যে হিন্দু আজো অস্পৃশ্যতা-বিষে জর্জ্জরিত অহিংসাকে সে প্রকৃতই জীবনে বরণ করতে পেরেছে এ বিশ্বাসের প্রশ্রয় দেওয়া আত্ম-বঞ্চনার তুল্য।

দেশ কি ভাবে তাঁর অহিংসামন্ত্রকে গ্রহণ করেছে সে-কথাটিও এই সম্পর্কে স্মরণীয়। মনে-প্রাণে অহিংসক হতে সে স্বীকৃত হয়নি। অহিংসা তার জন্য হয়েছে নিরস্ত্র প্রতিরোধ দুঃখ-স্বীকারের সংকল্পের সহায়তায়। সে যে দুর্ব্বল এ সম্বন্ধে সে সচেতন। এতদিন সে নিজেকে জান্‌তো নিরুপায় বলেই। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর সাহচর্য্য তাকে এই জ্ঞান দিয়েছে যে দুর্ব্বল সে যতই হোক তার সম্মতির উপরে প্রতিষ্ঠিত দেশের শাসন—সেই সম্মতিতে গোল-যোগ ঘট্‌লে শাসন ব্যাহত হতে পারে। তার এই নবলব্ধ শক্তির প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ দুই-ই সে করে' চলেছে। তাতে এর আবিষ্কর্ত্তা শঙ্কিত হয়েছেন এর ভবিষ্যৎ ব্যর্থতা চিন্তা করে। কিন্তু সেজন্যে ব্যস্ত হয়ে শুধু হিন্দুকে ডেকে যে সত্যই লাভ নেই। এ যুগের হিন্দু ও মুসলমান কেউই শুধু হিন্দু বা মুসলমান নয়—তারা অপরিহার্য্যরূপে হিন্দু ও মুসলমানের মিশ্রণ। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তারা একে অন্যকে উপেক্ষা করে চলতে পারে না। পারে একে অন্যের সহযোগী হতে অথবা শত্রু হতে। তাদের একের পক্ষে অন্যকে উপেক্ষা করে' চলবার চেষ্টা-মাত্রই হচ্ছে তাদের ভবিষ্যৎ সংঘর্ষকে অনিবার্য্য ও উৎকট করে' তোলা।

সমষ্টিগতভাবে অহিংসা-সাধনা কোনোদিন মানুষের সমাজে সম্ভবপর হবে কি না বলা কঠিন। কিন্তু যেহেতু মানুষ পশুমাত্র নয় সেজন্যে এর সম্ভাবনার কথা মনে স্থান না দেওয়াও তার পক্ষে কঠিন। শুধু হিন্দুকে ডেকে মহাত্মা গান্ধী তাঁর অহিংসামন্ত্রের সফলতা সম্পাদন করতে পারেন নি, এখন হিন্দু অহিন্দু দেশের সবাইকে ডাকলেই যে তাঁর মন্ত্র সফলতার পথে অগ্রসর হবে, এমন কথা বলবার দুঃসাহস আমাদের নেই। তবে তাঁর দেশের সবাইকে আহ্বান করলে তাঁর পরিবেষ্টন সম্বন্ধে সত্যাশ্রয়িতার পরিচয় তিনি বেশী দেবেন তা নিঃসন্দেহ, আর তাতে তাঁর সাধনার পথে বাধার পরিমাণ কমে যাবে। সত্যের প্রকৃতি এই যে সে আপোষ করে না, জয় করে; যে তার বিরোধিতা করে সে বিনষ্ট হয়। অহিংসা যদি মানুষের জন্য সত্য হয় তবে সবাই তা স্বীকার করবে, তা হোক না তাদের অতীত সংস্কার যত বিভিন্ন। তাছাড়া মহাত্মা গান্ধীর এই অহিংসা-সাধনের সঙ্গে যোগ ঘটেছে যে ভারতীয় স্বরাজ-সাধনার সেটি আকস্মিক নয়। ভারতীয় জীবনের অপরিসীম খণ্ডতার একান্ত প্রতীক্ষা এই অহিংসার জন্য—অহিংসার, অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি সহনশীলতার, শক্তিতেই এই খণ্ডতা অখণ্ডতায় রূপান্তরিত হবার পথে অগ্রসর হতে পারে। ধর্ম্মবর্ণনির্বিবশেষে ভারতবাসীদের একটি অখণ্ড জাতিতে রূপান্তরিত না হয়ে যে উপায় নেই তাদের একালের জীবনের প্রয়োজনে, এজন্যে সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িক চিন্তা শেষ পর্য্যন্ত কুচিন্তা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় জীবনের এই প্রয়োজন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। সেই সঙ্গে অতীতের ধর্ম্মবন্ধনও তাঁর জন্য দৃঢ়। তাঁর চিত্তটি বাস্তবিকই বড় জটিল।

তাঁর নেতৃত্বে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তা যে সুনিষ্পন্ন হবে তাতে দেশের সন্দেহ ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে। তবে তাঁর অহিংসার পরিচয়-স্থল যে তাঁর অকপট পরধর্ম্মপ্রীতি সে-সম্বন্ধে দেশ নিঃসন্দেহ হলে সেই অখণ্ড ভারতীয়তার পথে কয়েক পা অগ্রসর হতে পারতো।

১৩৪৬

ভারতবর্ষের সাধনা

রবীন্দ্র-রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে 'ভারতবর্ষ' বইখানির প্রবন্ধ-গুলো নূতন করে পড়া গেল।

মনে পড়ে এক সভায় রবীন্দ্রনাথ নিজের সম্বন্ধে বলেছিলেন,—গুরুর আসন তাঁর জন্যে নয়; তিনি বরং একটি বীণা—নানা তার তাতে, বিচিত্র সুর সেই সব তার থেকে উঠছে।—কথাটা মিথ্যা নয়। আর শুধু কবি রবীন্দ্রনাথ নন, হয়ত মানুষ মাত্রেই তাই। স্পষ্টভাবে যা সে বলে বা চায় তার চাইতে অনেক ব্যাপক ও অস্পষ্ট তার কামনা। কিন্তু গুরুগিরির দায় থেকে নিষ্কৃতিও বোধ হয় মানুষের নেই। তার মস্তিষ্ক তার জন্য এই বিপদ ডেকে এনেছে। 'ভারতবর্ষ' বইখানিতে রবীন্দ্রনাথকে দেখা যাচ্ছে গুরুর বেশে।

কি তিনি বলছেন? যা বলেছেন মোটের উপর তা উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা হিন্দু-নেতার বাণী। প্রবল-প্রতাপ ইয়োরোপের সম্মুখীন হয়ে দেশকে তাঁরা এই নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন যে, ভারত তার অতীত আদর্শ বিসর্জ্জন দিতে পারে না—বিসর্জ্জন দিলে সে হবে স্রোতের তৃণ। সেই অতীত আদর্শ বলতে তাঁরা বুঝেছিলেন প্রাচীন ঋষির আদর্শ—অলোভ ও অমত্ততার আদর্শ—যা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে এই পরিচিত শ্লোকে —

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।
—ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হবেন,
সমস্ত কর্ম্মফল তিনি ব্রহ্মে সমর্পণ করবেন।

এই শ্লোক রবীন্দ্রনাথের রচনায় উদ্ধৃত হয়েছে। আর তাঁর কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টি, আবেগ ও ভাষা-সামর্থ্যের গুণে এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব মনোরম হয়ে উঠেছে।

যে ইয়োরোপের সম্মুখীন ভারতকে হতে হয়েছে তার শক্তি ও সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সামগ্রী। কিন্তু তুল্যরূপে তাঁর অশ্রদ্ধার সামগ্রী সেই ইয়োরোপের দম্ভ ও লোভ। সেই দম্ভ ও লোভের মধ্যে ইয়োরোপের ভাবী অসার্থকতার বীজ লুক্কায়িত রয়েছে এ আশঙ্কা তাঁর মনে জেগেছে। তাই তিনি তাঁর দেশকে তার প্রাচীন আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন হতে যে আহ্বান করেছেন এক গভীর আকুলতা তাঁর সেই কণ্ঠস্বরে। সেই আকুলতা গভীরতর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'নৈবেদ্য' কাব্যে।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ, একালের পরিচিত কথায় যাকে বলা যায় Plain living and high thinking-এর আদর্শ (ব্রহ্মনিষ্ঠতা=আদর্শ-নিষ্ঠতা), তা এতটুকু অশ্রদ্ধার বস্তু নয়। বলা যেতে পারে, সর্ব্বকালের মানব-শ্রেষ্ঠদের এর উপরে আস্থা অপরিসীম। কিন্তু কথা হচ্ছে দেশের সামনে নূতন করে এই আদর্শের প্রচারের সমীচীনতা নিয়ে। আমাদের বক্তব্য এই :—

এই ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শকে দাঁড় করানো হয়েছে ইয়োরোপের রাষ্ট্রিক শক্তিলাভের আদর্শের বিরুদ্ধে। কবি বলেছেন—"আমাদের হিন্দু সভ্যতার মূলে সমাজ য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি য়ুরোপীয় ছাঁচে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য তবে আমরা ভুল করিব।"—কিন্তু সামাজিক শক্তির ও রাষ্ট্রীয় শক্তির এমন বিরোধিতা কি কল্পনা করা যায়?

বহুকাল পূর্ব্বে গ্রীক্‌রা বুঝেছিলেন, মানুষের চরম কৃতিত্ব রাষ্ট্র গঠনে। যীশুর মতবাদ যেভাবে বোঝা হয়েছিল সেই ইহ-বিমুখতার আদর্শ এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল দীর্ঘকাল। তারপর আবার রাষ্ট্র-গঠনের গৌরব সম্বন্ধে ইয়োরোপ সচেতন হয়েছে। ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ ঠিক ইহ-বিমুখতার আদর্শ নয়, অন্ততঃ যে বৈদিক ঋষিরা অনার্য্যদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়েছিলেন, তাঁদের ইহ-বিমুখ বলা যায় না। তবে বৌদ্ধ-প্রভাবে ও ভারতের মধ্যযুগের রাজনৈতিক পরাধীনতার দিনে এই ব্রহ্মবাদ প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহ-বিমুখতারই সমর্থন করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর নব-ভারতীয় ব্রহ্মবাদের অন্তরেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে ভারতবাসীর পরবশতার লজ্জা। অবশ্য এই লজ্জাই এর গৌরব-স্থল। কিন্তু জীবনের সহজ ধারা যে এই নব ব্রহ্মনিষ্ঠার মধ্যে কিঞ্চিৎ বিপর্য্যস্ত হয়েছে তা না বুঝলে চলবে না।

বাস্তবিক সমাজ ও রাষ্ট্রের পরস্পর-বিরোধিতা কল্পনা করাই যায় না। রাষ্ট্র সমাজের প্রাণ। এর বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এশিয়ার নব-জাগরণ চেষ্টায়। সে-চেষ্টা সার্থকতার পথে দাঁড়িয়েছে সেইসব দেশে যেখানে রাষ্ট্রিক শক্তি-লাভ ঘটেছে। অপর পক্ষে ভারতের শতবর্ষব্যাপী অকৃত্রিম নব-জাগরণ-চেষ্টা নব নব ব্যর্থতা লাভ করে চলেছে রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রবলতার অভাবে।

প্রাচীন ব্রহ্মবাদ বা যে কোনো "বাদ" মূলতঃ কবিত্ব। কবিত্ব জীবনের পরম সম্পদ, জীবন কবিত্বের দ্বারা মণ্ডিত, তবু কবিত্ব ও জীবন ঠিক এক কথা নয়। জীবনের মূল কথা অন্ন-সমস্যা ও আত্মরক্ষণ-সমস্যা, বিশেষ করে সমষ্টিগত জীবনে, কেননা জীবন মূলতঃ সমষ্টিগত ব্যাপার। কিন্তু আমাদের এই নব ব্রহ্মবাদে আমাদের সমষ্টিগত জীবনের অন্ন-সমস্যা আর আত্মরক্ষণ-সমস্যার কথা প্রায় ঠাঁই পায় নি। যদি কেউ বলেন, আমাদের সমষ্টিগত জীবনের অন্ন-সমস্যা আর আত্মরক্ষণ-সমস্যার ভার আমাদের হাতে নেই, তবে তিনি অন্যায় কথা বল্‌বেন। এমন কথা বলা আর মৃত্যুকে স্বীকার করে নেওয়া এক কথা। কিন্তু মৃত্যুকে স্বীকার করে নেওয়া জীবনের ধর্ম্ম নয়, জীবনের ধর্ম্ম ক্রমাগত আত্মবিকাশের চেষ্টা—সহস্র প্রতিকূলতা অতিক্রম বা আত্মস্থ করে।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্য-জীবনের আদর্শ অথবা Plain living and high thinking-এর আদর্শ মানব-শ্রেষ্ঠদের প্রিয় হয়েছে বহুর

কল্যাণ-কামনা এতে কেন্দ্রীভূত হবার সুযোগ পেয়েছে বলে। প্রচলিত ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকতা একালে পতিত হয়েছে এই বহুর কল্যাণ-কামনার সঙ্গে যোগের অভাবের জন্যে। কিন্তু এই 'বহুর কল্যাণ-কামনা' শেষ পর্য্যন্ত ভাববিলাসের ব্যাপার হতে বাধ্য যদি রাষ্ট্রিক সার্থকতা-লাভ এর না ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দীর Laissez faire ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য একালের সমষ্টি-কল্যাণ-তত্ত্বে আত্মবিসর্জ্জন করেছে, করে ধন্য হয়েছে। অবশ্য সমষ্টি-কল্যাণ-তত্ত্ব আজও আশানুরূপ সুন্দর হয়ে দেখা দেয় নি, Laissez faire (Let alone—যে যার পথে চলুক) ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও অসুন্দর ছিল যথেষ্ট পরিমাণে, তবে এই নব সমষ্টি-কল্যাণ-তত্ত্বের কার্য্যকারিতা যে অনেক বেশী তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।—রাষ্ট্রিক ক্ষমতার অতিচার দেখে কবি শঙ্কিত হয়েছেন। শক্তির এক দুর্দ্দমনীয় প্রবণতা অতিচারের দিকে। সে-প্রবণতাকে সংযত করবার জন্যে প্রেমের প্রয়োজন কম নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধ-পক্ষের প্রতিরোধ-ক্ষমতার প্রয়োজনও কম নয়। ইয়োরোপের দম্ভ ও লোভ যথেষ্ট পরিমাণে লালিত হয়েছে এশিয়া ও আফ্রিকার অজ্ঞানতা ও নির্বীর্য্যতার দ্বারা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাঁরা ভারতবর্ষের সাধনার বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে ভেবেছিলেন তাঁরা নিঃসন্দেহে এই সম্মানের অধিকারী যে তাঁদের দিশাহারা দেশবাসীর অন্তরে আত্মসম্মান-বোধ তাঁরা সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁদের নির্দ্দেশ বাস্তবিকই ভ্রান্ত নির্দ্দেশ। ভারতবর্ষের লোক জগতের অন্যান্য

সভ্যদেশের লোকের তুলনায় কোনো রকমেই অসাধারণ নয়—জ্ঞানেও নয় অজ্ঞানেও নয়—আর তাদেরও মুক্তি কোনো অসাধারণ পন্থায় ঘটবার নয়। জীবনের অর্থ সঙ্ঘবদ্ধতা, একথা সব ভাগ্যবান্ দেশের লোকে জেনেছে, ভারতবাসীদেরও জানতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কদের একটি মারাত্মক ত্রুটি এই যে ভারতবাসীর জীবনে এই সঙ্ঘশক্তি-অর্জ্জন যে কত বিঘ্নসঙ্কুল সে-সম্বন্ধে তাঁরা অনেকেই যথেষ্ট পরিমাণে অচেতন। হিন্দু সভ্যতা, মুস্‌লিম সভ্যতা, আর্য্য সংস্কৃতি, সেমীয় সংস্কৃতি, এসবের পূর্ণ সংরক্ষণ, ইত্যাদি কথা যথেষ্ট আবেগের সঙ্গে তাঁদের কেউ কেউ বল্‌তে পেরেছিলেন এই অজ্ঞতার প্রভাবে।

রবীন্দ্রনাথের যে-মতের আলোচনা করতে আমরা চেষ্টা করলাম, বলা বাহুল্য, সেইটিই তাঁর একমাত্র মত নয়। ভারত-বর্ষের মানুষ যে দোষে-গুণে জগতের অন্যান্য দেশের মানুষের আত্মীয়, এ শিক্ষা তাঁর কাছে থেকেই আমরা বেশী করে পেয়েছি। তবে ভারতবর্ষের সাধনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর এক-সময়ের এই চিন্তা ভারতবাসীর অন্তঃসারহীন দম্ভের লালনে সহায়তা করতে পারে, এ আশঙ্কা ভিত্তিহীন নয়। যাঁরা দেশের স্বাভাবিক নেতা তাঁদের আনুগত্য যেমন দেশের লোকদের জন্য প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রয়োজনীয় তাঁদের নির্দ্দেশ সম্বন্ধে দেশের লোকদের যথাযথ ধারণা।

১৩৪৭

একটি ঐতিহাসিক চরিত্র

সুলতান মাহ্‌মুদ ইতিহাসের এক অতি পরিচিত পুরুষ। কিন্তু তাঁর সাধারণ পরিচয় একজন অসাধারণ যোদ্ধা ও লুণ্ঠন-কারীরূপে। সেই লুণ্ঠনজাত ধনরত্নে তাঁর সুগভীর পরিতোষ জন্মেছিল। সেই সব ধনরত্নের জন্য মৃত্যুর পরে তাঁর বিদেহ আত্মার লোলুপতা ও শোক সা'দীর নিপুণ তুলিকায় রূপায়িত হয়েছে।

কিন্তু ঠিক এইভাবে সুলতান মাহ্‌মুদকে বোঝা সঙ্গত বলে মনে হয় না। প্রকৃত পক্ষে তিনি মুসলিম ইতিহাসে এক অতি উচ্চ আসন দখল করে আছেন। সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলতে চেষ্টা করব।

ফেরিশতার ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে ভারতের কোনো কোনো সামন্ত রাজার অবাধ্যতার জন্যে মাহ্‌মুদ ভারত-অভিযান করেছেন। কিন্তু শুধু "কাফের"দের দেশ ভারতবর্ষের দেব-মন্দির ও দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করবার জন্যেও যে তিনি ভারত-অভিযান করেছেন তার দৃষ্টান্তও ফেরিশ্‌তার গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। ব্রিগ্‌স্‌-অনূদিত ফেরিশ্‌তা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৫১ পৃষ্ঠায় এই বিবরণটি রয়েছে। মাহ্‌মুদের থানেশ্বর-অভিযান কালে তাঁর সামন্ত রাজা আনন্দপাল স্বীয় ভ্রাতার মারফত এই অনুরোধ মাহ্‌মুদকে বিজ্ঞাপিত করেন :—আনন্দপাল শাহানশাহ্‌

মাহ্মুদের প্রজা ও করদ রাজা, কিন্তু শাহানশাহ্ সমীপে তাঁর এই নিবেদন যে থানেশ্বর এদেশবাসীদের প্রধান ধর্ম্ম-স্থান; যদি এই মাহ্মুদের ধর্ম্মের অনুশাসন হয় যে তাঁর ধর্ম্মের অন্যান্য ধর্ম্মের উপরে জয়ী হওয়া চাই তবে নগরকোটের মন্দির ধ্বংস করে মাহ্মুদ তাঁর সেই কর্ত্তব্য পালন করেছেন। কিন্তু যদি থানেশ্বর সম্বন্ধে মাহ্মুদ তাঁর সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন করেন তবে আনন্দপাল এই অঙ্গীকার করছেন যে থানেশ্বরের সমস্ত রাজস্ব তিনি মাহ্মুদকে অর্পণ করবেন, মাহ্মুদের অভিযান প্রত্যাহারের ব্যয়ও তিনি বহন করবেন। আর আনন্দপালের ভ্রাতা মাহ্মুদকে পঞ্চাশটি হস্তী ও প্রচুর মণিমুক্তা উপঢৌকন দেবেন। উত্তরে মাহ্মুদ বলেন—বিশ্বাসীদের (মুসলমানদের) ধর্ম্মের এই নির্দ্দেশ যে পয়গম্বরের ধর্ম্মমত যত বিস্তার লাভ করবে, যত বেশী তাঁর অনুবর্ত্তিগণ প্রতিমা-পূজার বিলোপ সাধনে প্রয়াসী হবেন, তত বেশী তাঁরা বেহেশ্‌তে পুরস্কার লাভ করবেন; সেইজন্য তাঁর (মাহ্মুদের) কর্ত্তব্য—আল্লাহ্‌র প্রসাদাৎ হিন্দুস্থান থেকে প্রতিমা-পূজা নির্ম্মূল করা। কাজেই থানেশ্বরের মন্দির ধ্বংস থেকে বিরত থাকা তাঁর পক্ষে কিরূপে সম্ভবপর?—এই সঙ্গে সোমনাথ ধ্বংসকালে তাঁর এই বিখ্যাত উক্তি স্মরণীয়—প্রতিমা-বিক্রেতা মাহ্মুদরূপে নয় প্রতিমা-ধ্বংসকারী মাহ্মুদ রূপেই তিনি পরবর্ত্তীদের স্মৃতিপটে জাগরূক থাকতে চান।

সহজেই মনে হতে পারে, এই চিত্র যাঁর তিনি একজন ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তি; এরূপ ব্যক্তির অভ্যুদয় সব সমাজে সব দেশেই মাঝে

মাঝে ঘটেছে। কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক তাই-ই যে নয় তার সমর্থন রয়েছে এই সব ঘটনায় :

তাঁর এই সব হিন্দুস্থান-অভিযান যে ধর্ম্ম-যুদ্ধ, মাহ্‌মুদের নিজের ত সে-বিষয়ে সন্দেহমাত্র ছিল না। বহু যুদ্ধক্ষেত্রে যখন তাঁর সেনাদল বিপন্ন হয়ে পড়েছে তখন ঘোড়া থেকে নেমে পশ্চিমমুখী হয়ে মাটিতে মাথা লুটিয়ে তিনি বিজয়ের জন্য প্রার্থনা করেছেন ও প্রার্থনা-অন্তে নব-উৎসাহে সৈন্য পরিচালনা করে বিজয় লাভ করেছেন। কিন্তু শুধু মাহ্‌মুদ নিজে নন তাঁর সমসাময়িক মুসলমান-সাধারণও মাহ্‌মুদের এই সব অভিযান ধর্ম্ম-যুদ্ধই জ্ঞান করেছেন। তাঁর এক অভিযানে বহু সহস্র মুসলিম-তরুণ স্বেচ্ছাসৈনিক হয়ে তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। আর বাগ্‌দাদের তৎকালীন খলিফা মাহ্‌মুদের এই সব বিজয়ে পরম সন্তোষ জ্ঞাপন করে তাঁকে আমীন-উল্‌-মিল্লত (ধর্ম্ম-রক্ষক) ও ইয়ামীন-উদ্‌-দৌলত (রাষ্ট্র-রক্ষক) এই দুই উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

এর সঙ্গে আরো ভাবতে হবে মাহ্‌মুদের চরিত্রের কথা। ধনলোভ তাঁতে ছিল নিঃসন্দেহ, কিন্তু সুবিচারক হবার জন্যে তাঁর প্রয়াসও ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর এক গরীব প্রজার সুন্দরী স্ত্রীকে আত্মসাৎ করতে প্রয়াস পান। সেই যুবকের দোষ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে মাহ্‌মুদ স্বীয় তরবারির আঘাতে তাঁকে বধ করেন। ফেরিশ্‌তা মন্তব্য করছেন এরূপ ন্যায় বিচারের দৃষ্টান্ত জগতে একান্ত বিরল।

আর এই যমদূত-সদৃশ যোদ্ধার অন্তরে ছিল অপরিসীম সৌন্দর্য্যানুরাগ। একবার ভারতের এক রাজা তাঁকে এক সুন্দর প্রশস্তি-কবিতা উপহার দিয়ে তাঁর কোপ থেকে অব্যাহতি পান। আর একবার একটি মন্দিরের গঠন-সৌন্দর্য্যে তিনি এত মুগ্ধ হন যে মন্দিরটি ধ্বংস না করে তিনি তাঁর অভিযান শেষ করেন। ধর্ম্মান্ধতা বলতে মনোভাবে যে একদেশদর্শিতা বা অস্বাভাবিকতা বোঝায় তার সঙ্গে এমন সৌন্দর্য্যানুরাগের যোগ কল্পনা করা কঠিন।

সুলতান মাহ্‌মুদ যদি একজন রণকুশলী ধর্ম্মান্ধ ও লুণ্ঠনকারী মাত্র না হন তবে তিনি কি?—কোনো মানুষকেই নিঃশেষে বুঝে ফেলা প্রায় অসম্ভব, বিশেষ করে তিনি যদি শক্তিমান্ হন। মাহ্‌মুদ সম্বন্ধে যে-কথা আমাদের মনে হয়েছে কুণ্ঠার সঙ্গেই আমরা তা নিবেদন করছি।

মাহ্‌মুদকে বুঝতে হলে স্মরণ করবার প্রয়োজন আছে মুসলমানের ঐতিহাসিক ধারার কথা। অতি সংক্ষেপে সেই ধারা এই:—হজরত মোহম্মদ একজন মানব-বন্ধু আরব—স্বদেশবাসীদের মূঢ়তায় ও কদাচারে যাঁর চিত্ত বিশেষভাবে ব্যথিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে সৎলোক জেনেও তাঁর দেশবাসিগণ তাঁর উপদেশের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে চলে। অবশেষে এই নব প্রচারকের মুষ্টিমেয় অনুচরের সঙ্গে যুদ্ধে তারা যখন পরাস্ত হয় তখন তাঁর অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী হয়ে যেন বন্যাবেগে তারা তাঁর মণ্ডলীভুক্ত হয়। কিন্তু এই মানব-বন্ধু ও কাণ্ডজ্ঞান-রসিকের উদ্দেশ্য আদর্শ যে তাঁর অনুবর্ত্তীদের অনেকে বুঝতে পারেনি তার পরিচয়

রয়েছে তাঁর মৃত্যুর পরে তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের বিদ্রোহে ও অল্পকাল মধ্যে উম্মীয়-বংশীয়দের আদিম আরব-স্বেচ্ছাচারে প্রত্যাবর্ত্তনে। যে অল্পসংখ্যক লোক হজরত মোহম্মদের জীবনাদর্শ অনেকখানি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন তাঁরা কিছুকাল উম্মীয়-বংশীয়দের বিরুদ্ধে বিফল বিদ্রোহ পরিচালনা করেন ও শেষে মুখ্যতঃ নির্জ্জন ধ্যানধারণা ও শাস্ত্রচর্চ্চা বরণ করেন। কোনো কোনো বিষয়ে —যেমন সুকুমার বিদ্যার চর্চ্চায়—ইসলামীয় অনুশাসনে যে কঠোরতা চোখে পড়ে তার উৎপত্তি-ক্ষেত্র হজরত মোহম্মদের চরিত্র ও কোরআনের নির্দ্দেশ তত নয় যত এই উম্মীয়-বংশীয়দের কদাচার।

উম্মীয়-বংশীয়দের পরে আব্বাস-বংশীয়েরা পারশ্যের সাম্রাজ্য-তন্ত্র ও বিলাস-বিভ্রমের প্রভাবাধীন হন। সেই সঙ্গে এই যুগে মুসলমানদের লাভ হয় গ্রীক জ্ঞানবত্তার সঙ্গে পরিচয়। ফলে মুসলমান-সভ্যতা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয় ও মুসলমান হয়ে ওঠে তৎকালীন জগতের শ্রেষ্ঠ সভ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার এই সমুন্নতি দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে, ইসলামের প্রায় সূচনা থেকেই অনুবর্ত্তনপ্রিয়তার দিকে মুসলিম-সাধারণের প্রবণতা। বিচার-প্রিয়তা ইসলামে লক্ষ্যযোগ্য হয় ইমাম আবু হানিফার সময় থেকে, আর এক বিশেষ পরিণতি লাভ করে আব্বাস-বংশীয়দের যুগের মোতাজেলাদের যত্নে। কিন্তু সেই সময়েই বিচারবাদের সঙ্গে অনুবর্ত্তনপ্রিয়তার সংগ্রামও তীব্র হয়, আর সর্ব্বসাধারণের চিত্তে অনুবর্ত্তনপ্রিয়তার মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়।

এই কালে সুলতান মাহ্‌মুদের আবির্ভাব। সেই সঙ্গে যদি স্মরণ করা যায় যে, যে-ভূখণ্ড তাঁর পিতৃভূমি পরে পরে তারই আশ-পাশ থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন মধ্যযুগের বিশ্বত্রাস হালাকু, চেঙ্গিজ ও তৈমুর, তবে মাহ্‌মুদের চিত্ত ও কীর্ত্তি উভয়েরই উপরে অনেকখানি আলোকপাত হয় বলে আমাদের ধারণা।

ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তার গুণে তেমন নয় যেমন দোষে। জাতি বা সভ্যতা-বিশেষেরও বৈশিষ্ট্য তেমনি ফোটে তার দুর্ব্বলতায়। এর প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যায় হিন্দুর প্রতীক-প্রীতির আধিক্য, শ্বেতজাতিদের অশ্বেত-বর্ণ-বিদ্বেষ, আর মুসলমানের প্রতীক-বিদ্বেষ। নানা ঐতিহাসিক কারণে এর উদ্ভব—তার কিছু কিছু ইঙ্গিত করা হয়েছে—কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা এই যে, বিশেষ বিশেষ জাতিতে বা সভ্যতায় এমন দুর্ব্বলতা দৃঢ়মূল হয়। অবশ্য এইসব দুর্ব্বলতার প্রতিষেধ-ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, নইলে কোনো জাতি বা সভ্যতার দীর্ঘস্থায়িত্ব সম্ভবপর হতো না। তবে এই ধরণের জাতি-গত বা সভ্যতা-গত দুর্ব্বলতা যখন আশ্রয় পায় কোনো শক্তিমানের মস্তিষ্কে ও বাহুতে তখন সেই শক্তিমানের লাভ হয় এক অভাবনীয় প্রতিনিধিত্ব।

সুলতান মাহ্‌মুদকে কেন আমরা মুসলিম ইতিহাসের এক অসাধারণ পুরুষ বলেছি আশা করি এইবার তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর অসাধারণত্ব গুণে তেমন নয় যেমন দোষে—মুসলিম-সভ্যতার এক বিশেষ দুর্ব্বলতা তাঁর রণ-প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভীষণ-মনোহর রূপ ধারণ করেছে।

সুলতান মাহ্মুদ ও তাঁর মনোভাবাপন্ন মুসলমানেরা যে তাঁদের প্রিয় ইসলামের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি তা সহজেই বুঝতে পারা যায় কোর্আনের এই ধরণের বাণী থেকে :—

ধর্ম্মে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ। ২ : ২৫৬

আল্লাহ্ ভিন্ন তারা অন্যান্য যাদের উপাসনা করে তাদের গালি দিও না, পাছে তারা অজ্ঞানতাবশতঃ সীমা অতিক্রম করে আল্লাহ্‌কে গালি দেয়। ৬ : ১০৯

যারা…ভালোর দ্বারা মন্দ বিদূরিত করে, তারা সুখকর আশ্রয় লাভ করবে। ১৩ : ২২

তারাই পরমকারুণিকের দাস যারা বিনম্র হয়ে ধরণীবক্ষে বিচরণ করে, আর অজ্ঞরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে, 'সালাম' (শান্তি)। ২৫ : ৬৩

কিন্তু ইসলাম না বুঝলেও মুসলমান সমাজে আজো যে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাতে সন্দেহ নেই।

কোনো সভ্যতার বা জাতির বিশেষ দুর্ব্বলতার সঙ্গে তার প্রতিষেধ-ব্যবস্থাও থাকে, এ-কথা বলতে চেষ্টা করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে অনুবর্ত্তনপ্রিয়তা ও যুক্তিপ্রিয়তা দুই-ই আমরা দেখেছি। সুলতান মাহ্মুদের কালেও দেখা যাচ্ছে তাঁর "ধর্ম্ম-যুদ্ধ" ও "কাফের"-পীড়ন সম্পর্কে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ আল্-বেরুণীর ক্ষোভ। স্বধর্ম্মের প্রতি এই মনস্বীর অনুরাগ সুগভীর; অথচ সে-অনুরাগ তাঁতে অন্ধতা বা মত্ততা আনেনি, এনেছে অনির্ব্বাণ সত্য-প্রীতি ও জগৎ-প্রীতি।

কিছুকাল পূর্ব্বে সুলতান মাহ্‌মুদ সম্পর্কে আলিগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের একটি রচনা পড়েছিলাম। তাতে তিনি মাহ্‌মুদের হিন্দুমন্দির-ধ্বংস-ব্যাপারটির প্রতি অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু বীর ও প্রতিমা-ধ্বংসকারী মাহ্‌মুদ মুসলিম-সাধারণের চিত্তে যে গৌরবের আসন অধিকার করে আছেন তা সহজে হতশ্রী হবার নয়। তা হতশ্রী হতে পারবে সেইদিন যেদিন আল্‌-বেরুণীর মতো মুসলিম-শ্রেষ্ঠদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মুসলিম-সাধারণ যোগ্যভাবে সচেতন হবে। মনে হয়, একালের বিজ্ঞান ও বিশ্ব-সংযোগ মুসলিম নরনারীর কাছে এই প্রশ্ন স্পষ্টভাবে তুলেছে, কোন্‌টি আজ তাদের গতি-পথ—সুলতান মাহ্‌মুদের পথ? না আল্‌-বেরুণীর পথ?

১৩৪৭

নজরুল ইসলাম

কবি নজরুল ইসলামের সাহিত্যিক জীবনের চারিটি স্তর নির্দ্দেশ করা যেতে পারে।

প্রথম স্তর—তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূচনা থেকে "বিদ্রোহী" প্রকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় স্তর—"বিদ্রোহী" প্রকাশের পর থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসান পর্য্যন্ত।

তৃতীয় স্তর—তাঁর সঙ্গীত রচনার, বিশেষ করে, গজল রচনার যুগ।

চতুর্থ স্তর—তাঁর একালের যোগী-জীবন।

প্রথম স্তর

শরৎচন্দ্রের মতো নজরুল ইসলামও অতি অল্পদিনে বাংলার সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। "বিদ্রোহী" প্রকাশের পূর্ব্বেই তাঁর নবীনতা অথবা উদ্দামতা আর ছন্দ-সামর্থ্যের প্রতি বাংলার সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ আর "বিদ্রোহী" রচনা এর মধ্যে কালের ব্যবধান সামান্য—বোধ হয় দুই বৎসরের বেশী নয়। তবু তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের কথা ভাবতে গিয়ে তাঁর ভাব-জীবনের এই স্তরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার প্রয়োজন আছে। "বিদ্রোহী" থেকে তাঁর মানস-

জীবনের গতি যে-মুখী হলো তার সঙ্গে তাঁর পূর্ব্বের ভাব-জীবনের সঙ্গতি অসঙ্গতি দুইই রয়েছে। তাঁর এই যুগের একটি বিশিষ্ট রচনা তাঁর "বাঁধন-হারা" পত্রোপন্যাস। এতে কবি যে তাঁর তরুণ জীবন কিছু পরিমাণে চিত্রিত করেছেন, অনেকে বোধ হয় তা জানেন। এই রচনায় দেখা যাচ্ছে—কবি একজন অসাধারণ ভাববিলাসী ও অভিমানী, ব্যর্থপ্রেমের বেদনায় গভীরভাবে আহত। কিন্তু এই আঘাত যত বড়ই হোক এতে মুহ্যমান তিনি হননি। এই নিষ্করুণ আঘাতে তাঁর অন্তর থেকে উৎসারিত হয়েছে একটি মধু-স্রোত; কিন্তু এতে লাঞ্ছিত এমন কি ম্রিয়মাণও তিনি হননি। তবে তিনি অবলম্বন করেছেন এক দায়িত্বহীন ভবঘুরের জীবন—সেই দায়িত্বহীনতায় তাঁর সুনিবিড় আনন্দ।

এই যুগের ভাবে-ভোলা কবি ছিলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের যৌবনের প্রেমসঙ্গীতে, আত্মহারা; রবীন্দ্রনাথের পরে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি; আর তাঁর প্রিয় ছিলেন ইরাণীকবিতিলক হাফিজ—তাঁর সুফী-তত্ত্বের জন্যে নয় তাঁর প্রেমের উন্মাদনার জন্যে।

আর এক শ্রেণীর ভাবুকদের প্রতিও কবির গভীর শ্রদ্ধা ছিল—তাঁরা বাংলার সন্ত্রাসবাদীর দল।

দ্বিতীয় স্তর

রবীন্দ্রনাথের যেমন "নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ" অথবা "এবার ফিরাও মোরে," নজরুলের তেম্নি "বিদ্রোহী"—জীবনে হঠাৎ একটি

বৃহৎ চেতনার আবির্ভাবের গৌরব এসবে বিধৃত। কিন্তু এই দুই কবির জীবন-ধারার উপরে তাঁদের এই ভাবোচ্ছ্বাসের প্রভাবে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। "নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ" অথবা "এবার ফিরাও মোরে" রবীন্দ্রনাথের কবি-চিত্তে যত বড় দোলাই দিক এ-সবের প্রভাবে তাঁর জীবনের সাধারণ ধারায় যে পরিবর্ত্তন এসেছে তা লক্ষ্যযোগ্য হয়নি দীর্ঘ দিন। মনে হয়, কবি যেন সর্ব্বংসহা প্রকৃতি—যত বড় ঝড়-বৃষ্টিই সেই প্রকৃতির বুকের উপরে তাণ্ডব জমিয়ে তুলুক, পরদিন সূর্য্যোদয়ে হাসিমুখে জেগে উঠ্‌তে তার বাধে না। নজরুল ইসলামও "বিদ্রোহী" রচনার পরে যে একেবারে বদ্‌লে গিয়েছিলেন ঠিক তা নয়; "বিদ্রোহী" কবিতাতেও দেখা যাচ্ছে, একদিকে তিনি যেমন নিজের ভিতরে অনুভব করছেন সাইক্লোনের শক্তি অন্যদিকে তেম্‌নি তিনি মুগ্ধ "চপল মেয়ের কাঁকন চুড়ির কনকনে"র ছলনায়। তবু এ কথা সত্য যে "বিদ্রোহী"র আকর্ষণ কবিকে বাস্তবিকই ঘর-ছাড়া করেছিল। সেই দিনে তাঁর সাম্যবাদ প্রচার আর বেপরোয়া শিকল ভাঙার গানের কথা যাঁদের মনে আছে তাঁরা স্মরণ করতে পারেন—প্রচণ্ড ধূমকেতুর মতো কি এক ভীষণ-মনোহর জীবন কবির ভিতরে সূচিত হয়েছিল।

১৩২৬ সালে—ইংরেজি ১৯১৯ সালে—নজরুল ইসলাম যখন কলকাতার সাহিত্যিক-সমাজে পরিচিত হন তখনই এক হিসাবে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী। সেদিনে বাংলার সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল সে কথা বলা হয়েছে, সেই সঙ্গে এই

কথাও স্মরণ করা যেতে পারে যে "বিদ্রোহী" প্রকাশের পূর্ব্বেই 'শাতিল আবর' 'মোহররম' 'কোরবাণী' প্রভৃতি যেসব জনপ্রিয় কবিতা তিনি লিখেছিলেন সে-সবে ব্যক্ত হয়েছিল মুসলমান সমাজের গতানুগতিক জীবনের প্রতি ধিক্কার, এক বলিষ্ঠ নব জীবনারম্ভের জন্য তীব্র কামনা, আর অস্ত্রশস্ত্রের শক্তি ও মহিমায় তাঁর প্রত্যয়। এটি ছিল ভারতীয় মুসলমানদের জন্য খেলাফত যুগ। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ওহাবী-বিদ্রোহ দমনের পরে থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের স্বদেশী আন্দোলন পর্য্যন্ত বাংলার মুসলমানের ইতিহাস মোটের উপর এক গভীর নৈরাশ্যের ইতিহাস। সেই নৈরাশ্যের কালোমেঘ তাদের চোখের সামনে খানিকটা কেটে গেল স্বদেশী আন্দোলনের যুগে যখন আধুনিক শিক্ষার দিকে তাদের মন স্পষ্টভাবেই ঝুঁকে পড়্লো। সেই দিনে বাংলার মুসলমানের জন্য—অন্ততঃ শিক্ষিত মুসলমানের জন্য—আদর্শস্থানীয় ছিল বাংলার শিক্ষিত হিন্দু-সমাজ যদিও স্বদেশী আন্দোলনে পূরোপূরি ঝুঁকে পড়া এই শিক্ষিত মুসলমানদের অনেকের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। মনে পড়ে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের কিছু পরে, কলকাতায় সদ্য-আগত তরুণ নজরুল ইসলামকে মোহাম্মদ এয়াকুব আলি চৌধুরীর মতো একজন চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান সাহিত্যিক বলেছিলেন "আপনাকে মুসলমান বারীন ঘোষ হতে হবে।" স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার হিন্দুর যে সাফল্য মুখ্যতঃ তাইই প্রেরণা জুগিয়েছিল মুসলমানের এই খেলাফত আন্দোলনে। কিন্তু হিন্দুর

আয়োজনের বিপুলতা তাঁদের ছিল না, ফলে সফলতা তাঁদের জন্য হচ্ছিল সুদূরপরাহত। তাঁদের কেবল লাভ হচ্ছিল দিগ্‌-দেশ-বিহীন এক বিক্ষুব্ধ মানসিকতা। তরুণ নজরুল, অর্থাৎ "বিদ্রোহী" রচনার পূর্ব্বের নজরুল, এক হিসাবে ছিলেন এই খেলাফত যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি। তাঁর 'মোহর্‌রম' কবিতার অধুনা-পরিত্যক্ত শেষ দুটি চরণ এই সম্পর্কে স্মরণ করা যেতে পারে—

দুনিয়াতে দুর্ম্মদ খুনিয়ারা ইসলাম—
লহু লাও, নাহি চাই নিষ্কাম বিশ্রাম।

কিন্তু "বিদ্রোহীতে" তাঁর মানসিক কুয়াসা এতখানি কেটে যায় যে তিনি যেন এক নতুন জীবন নিয়ে জেগে ওঠেন, নিজেকে ও জগৎকে দেখ্‌তে আরম্ভ করেন এক নতুন দৃষ্টিতে।

বাংলা দেশে এক শ্রেণীর সাহিত্য-রসিক আছেন যাঁরা নজরুল ইসলামকে জ্ঞান করেন একজন যুগ-প্রবর্ত্তক কবি। আজকার দিনে তাঁদের সংখ্যা-শক্তি কেমন জানি না, তবে নজরুলের প্রতি তাঁদের কারো কারো অন্তরের গভীর অনুরাগের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। তাঁদের প্রতিপাদ্যের প্রধান অবলম্বন এই বিদ্রোহী। তাঁদের ধারণা, এমন একটা ওজস্বিতা নজরুলের এই "বিদ্রোহী" কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে যা বাংলা-সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন—বাংলার দার্শনিক আবহাওয়ায় এ চিন্তা-লেশহীন ভাস্বর-ললাট চির-তারুণ্য, এই দ্বিধাহীন দুর্ম্মদ তারুণ্যই বাংলা সাহিত্যে নজরুল-প্রতিভার চিরগৌরবময় দান।

যাঁদের এই মত, মনে হয় না নজরুলের এই তারুণ্য বাস্তবিকই তাঁরা বুঝতে চেষ্টা করেছেন। প্রথমেই স্মরণ করা দরকার রবীন্দ্রনাথের "বলাকা"র যুগে নজরুল-প্রতিভার উন্মেষ।

আমরা চলি সমুখ পানে
কে আমাদের বাঁধবে,
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে

অথবা

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে অবুঝ, ওরে সবুজ,
অধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা

অথবা

শিকল-দেবীর ঐ যে পূজা বেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া?
পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মাতন বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্‌রে বাছা বাছা
আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা

ইত্যাদি ছত্র সে-যুগের বাংলার শিক্ষিত তরুণ-সমাজে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল—এক হিসাবে বাংলার তরুণ-

আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়েছিল এই "বলাকা" কাব্যের সাহায্যে। দ্বিতীয়তঃ, নজরুলের লেখনীতে যে-তারুণ্য রূপ পেয়েছে তার সাহিত্যিক মর্য্যাদা কেমন সেটিও একটি বড় অনুধাবনের বিষয়। একটু মনোযোগী হলেই চোখে পড়ে, নজরুলের রচনা, বিশেষ করে তাঁর "বিদ্রোহী" যুগের রচনা, অনবদ্য নয়। শ্রেষ্ঠ কবিদের বিশেষ বিশেষ কবিতায় কবি-কল্পনার যে পূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ পায় নজরুলের রচনায় সেটির অভাব মাঝে মাঝে প্রায় বেদনাদায়ক হয়েছে। নজরুল যে পূর্ণাঙ্গ কবিতার রচয়িতা তেমন নন, তাঁর কবি-প্রতিভা বরং প্রকাশ পেয়েছে উৎকৃষ্ট চরণের রচনায়, এ উক্তি করা যেতে পারে। অবশ্য এমন সাহিত্য-রসিক আছেন যাঁরা কোনো কবিতার, বিশেষ করে দীর্ঘ কবিতার, সমগ্রতার সৌন্দর্য্যে মনোযোগী হওয়া তেমন প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন না। তাঁদের কাছে কবিতা বরং উৎকৃষ্ট চরণের অথবা বাক্যাংশের সমষ্টি —মুক্তার মালা যেমন মুক্তার সমষ্টি। এই শ্রেণীর সাহিত্য-সমঝদারদের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেও বলা যায়, কবিতার বিভিন্ন চরণ অথবা বাক্যাংশ যখন একত্র গ্রথিত করবার প্রয়োজন হয় তখন তাদের একত্রসমাবেশ যাতে অদ্ভুতদর্শন না হয় সেদিকে মনোযোগী হওয়া কবির জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু নজরুলের "বিদ্রোহী" যুগের অনেক কবিতায় দেখা যাবে—"বিদ্রোহী"ও সে-সবের অন্তর্গত—বিভিন্ন ভাবের একত্রসমাবেশের সঙ্গতি সুষমা অথবা যৌক্তিকতা বিষয়ে কবি বেশ উদাসীন হয়েছেন। —কিন্তু এত ত্রুটি সত্ত্বেও এমন একটা প্রাণশক্তির ছাপ তাঁর

"বিদ্রোহী" যুগের অনেক কবিতায় মুদ্রিত হয়েছে যার জন্য তাঁর মাহাত্ম্য স্বীকার না করেও উপায় নেই। বাস্তবিক আমাদের সাহিত্যে এক ভয়ভাবনাহীন তারুণ্যের তিনি স্রষ্টা পূরোপূরি না হলেও লালয়িতা। কিন্তু সাহিত্য-শিল্পী হিসাবে এই যুগে তাঁর রেখাপাতে অপরিচ্ছন্নতা এতখানি প্রকাশ পেয়েছে যে তাঁর সাহচর্য্য রসিক পাঠককে আনন্দ যা দেয় দুঃখও সেই তুলনায় কম দেয় না।

এই যে নজরুলের অত্যাশ্চর্য্য শক্তি, অথচ সাহিত্যে তার অনবদ্য প্রকাশের অভাব, এটি তাঁর সাহিত্যের পাঠকদের দুঃখ বা ক্ষোভের কারণ না হোক—এটি বরং তাঁদের অন্তরে সঞ্চারিত করুক তীক্ষ্ণতর জিজ্ঞাসা। সেই জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হলে দেখা যাবে, কবি তিনি নিঃসন্দেহ—অনুভূতির গোপন আয়োজন তাঁর জগতে কখনো কখনো ঘটায় বাণীর অপূর্ব্ব বিদ্যুৎ-দীপ্তি—কিন্তু কবি তিনি যত বড় তার চাইতে অনেক বড় তিনি যুগ-মানব। যুগের বেদনা ও উন্মাদনা তাঁতে এত প্রবল যে কবির কল্পনা-লোকে অবস্থান তাঁর জন্য দুঃসাধ্য। এর দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় তাঁর শ্রেষ্ঠ ইসলামী কবিতা "খালেদ"। খালেদের মহিমা উদাত্ত কণ্ঠে গাইবার চেষ্টাই তিনি করেছেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, খালেদের বীরমূর্ত্তি পূর্ণভাবে রূপায়িত করার চাইতে তাঁর মনে প্রবলতর তাঁর সমসাময়িক মুসলমান-সমাজের জন্য বেদনা অথবা অস্থিরতা। অবশ্য কবির সৃষ্টি আকাশ-কুসুম নয় কখনো, কবির কাব্য-ফুল মাটির গাছেরই ফুল, অন্য কথায়, যুগধর্ম্মের

বেদনায় কবি-মানস লালিত ও গঠিত। তবু গাছ আর ফুল যেমন এক জিনিষ নয়, কোনো যুগের জীবন ও সেই যুগের কাব্যও ঠিক এক জিনিষ নয়। Literature is journalism that lasts (যে সাংবাদিকতা টিকে যায় তার নাম সাহিত্য) সাহিত্যের এই এক চমৎকার সংজ্ঞা একজন সাহিত্য-রসিক দিয়েছেন। কিন্তু এই যে শেষের কথা that lasts, যা টিকে যায়, এরই মধ্যে রয়েছে সাহিত্যের মূল তত্ত্ব। সাংবাদিকতা স্থায়ী হয় না, কিন্তু সাহিত্য স্থায়ী হয়, এই জন্য যে, সাংবাদিকতা প্রতিদিনের জীবনের মতো অস্থির, অপূর্ণাঙ্গ, নিয়ত-পরিবর্ত্তন-শীল—তা যেন প্রতিদিনের জীবনের ফটোগ্রাফ। কিন্তু সাহিত্য ঠিক তা নয়, তা অনেকখানি অচঞ্চল, অনেকখানি পূর্ণাঙ্গ, কেননা, ঠিক বাস্তবলোকে নয় কল্পনা-লোকে অথবা সৌন্দর্য্য-লোকে তার অধিষ্ঠান। কিন্তু এই কল্পনা-লোকে বা সৌন্দর্য্য-লোকে প্রতিষ্ঠিত হবার অবসর যেন নজরুলের নেই, রুচিও যেন তাঁর তাতে নেই—প্রতিদিনের জীবনের তাড়নায় তীব্রভাবে তাড়িত হয়ে তিনি চলেছেন, আর এই তাড়না-ভোগে তাঁর যেন গভীর আনন্দ। এটি দোষও বটে গুণও বটে, এবং এর জন্যই নজরুলকে এ-যুগের একজন অসাধারণ কবি বলা কঠিন, কিন্তু এ-যুগের একজন অসাধারণ ব্যক্তি তিনি নিঃসন্দেহ।

বলা হয়েছে, প্রতিদিনের জীবনের তীব্র তাড়নায় তাড়িত হয়ে চলায় কবি নজরুলের বেশ আনন্দ। কথাটি আর একটু বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন আছে। প্রতিদিনের হাসি-কান্নার

জীবন চিরদিনই মানুষকে আনন্দ দিয়ে এসেছে। নইলে জগৎ শ্মশানে পর্য্যবসিত হতো। কিন্তু প্রাকৃত মানুষের মনোভাব যাইই হোক শিক্ষিত মানুষ প্রতিদিনের জীবনকে সব সময়ে যে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেছেন তা নয়। বরং মধ্যযুগ বলতে মানুষের ইতিহাসের যে স্তর নির্দ্দেশ করা হয় তাতে দেখা যায়, সংসারের প্রতিদিনের জীবনের প্রতি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতেই শিক্ষিতেরা তাকিয়েছেন। আধুনিক যুগ এক হিসাবে তার প্রতিবাদ, আর এই প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছে আজকে থেকে নয়। আমাদের দেশেও এই প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছে ইংরেজ রাজত্বের প্রায় সূচনায়। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে এই প্রতিবাদ পূর্ণাঙ্গ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালে। এই প্রতিবাদ আজ আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির এক creed, ধর্ম্ম-বিশ্বাস, এক সময়ে যেমন তাঁদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ছিল বৈরাগ্য। নজরুল একালের তেম্নি প্রত্যয়শীল একজন ব্যক্তি। তবে তাঁর বিশেষত্ব এই যে এই প্রত্যয় তাঁতে অনেকের চাইতে বলবত্তর—এতখানি প্রবলতা তাঁর এই বিশ্বাসে বিদ্যমান যে আপাতদৃষ্টিতে যে সব মনে হয় অদ্ভুত খেয়াল-খুশী, সে-সবকেও মহত্তর মর্য্যাদা দিতে তাঁর বাধে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর "আলেয়া" নাটক। নরনারীর প্রেমের সম্বন্ধের যাথার্থ্য নিরূপণ এ-ক্ষেত্রে তাঁর একটি সমস্যা। অবশ্য তীব্র সমস্যা নয়। সমাধান এই দাঁড়ালো যে কার মন যে কখন কোন্ দিকে ঝুঁকে পড়বে তার কিছুই ঠিক ঠিকানা নেই। আরো একটি সমাধান দাঁড়ালো

যে শক্তিমান্ জীবন ভোগ করে যাবেন, সে-ভোগ যদি অন্যের জন্যে হয় দুর্ভোগ তবু চলবে তাঁর ভোগের অভিযান। কথাটি যে আপত্তিকর কবি সে-বিষয়ে সজাগ, কিন্তু এই বলে তিনি কথাটি চুকিয়ে দিচ্ছেন যে যৌবন-বেগের এই ত ধারা।—বলা বাহুল্য, যে সমস্যার অবতারণা কবি করেছিলেন তার কোনো ভাল সমাধান তিনি দিতে পারলেন না; ভোগের পথও কুসুমাস্তীর্ণ নয়। কিন্তু সমস্ত অকৃতকার্য্যতার মধ্যে কবি এক বিষয়ে আশ্চর্য্যভাবে কৃতকার্য্য হলেন—সহজ সরল কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করতে পারলেন, জীবন তাঁর কাছে মধুময়, আরো ঘোষণা করতে পারলেন—এত সুষমাময় চমৎকারিত্বময় যে জীবন তার মায়ায় চিত্ত তাঁর বন্দী হয়ে পড়ছে না, ভুল-ভ্রান্তি, ভোগ-দুর্ভোগ, সমস্তের ভিতর দিয়ে চলেছেন তিনি সামনের দিকে।—একালের এই জীবন-বাদ ও গতি-বাদের যাঁরা শ্রেষ্ঠ কবি, যেমন Walt Whitman ও রবীন্দ্রনাথ, তাঁদের বাণীর সঙ্গে তুলনায় নজরুলের বাণীর ত্রুটি সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু সেই সঙ্গেই চোখে পড়ে, বাণীর ত্রুটি তাঁতে যতই থাকুক জীবনের উপলব্ধি তাঁর সুগভীর। তাঁর বিখ্যাত কবিতা-সমষ্টি "সাম্যবাদী" সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। এতে তাঁর যুক্তিতর্ক যেমন প্রচুর তেম্‌নি দুর্ব্বল। কিন্তু সে-সবের মধ্য দিয়ে যে বেদনাময় চিত্তের প্রকাশ ঘটেছে তা পরম শ্রদ্ধার্হ।

নজরুলের কবি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আরো একটি বড় ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে। নজরুলের ভিতরে তারুণ্য চমৎকার,

জীবনের আনন্দ তিনি সহজ ভাবে অনুভব করতে পারেন, নানা দিক দিয়ে তিনি একজন সহজ মানুষ—এ-সবের কিছুই মিথ্যা নয়। কিন্তু এই সঙ্গে এ-কথাও বুঝবার আছে যে অন্তরের গোপনতম প্রদেশে তিনি তাত্ত্বিক—আর সেই তাত্ত্বিকতা তাঁর যেন জন্মগত। তাঁর এই পরম প্রিয় তত্ত্বের নাম দেওয়া যেতে পারে লীলাবাদ—ইংরেজিতে যা সাধারণত: Pantheism নামে পরিচিত। এই দৃষ্টিতে ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য শেষ পর্য্যন্ত নেই —ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন, সব কিছুই ভগবানের লীলা। এই তত্ত্বকে বলা যায় একই সঙ্গে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। হিন্দু-চিন্তার এটি যে মর্ম্মকথা তা না বল্লেও চলে, সুফী-চিন্তারও এটি মর্ম্মকথা—এক হিসাবে প্রাচীনকালের ভাবুকদের এটি পরম আশ্রয়। এই হিন্দু-মুসলমানের মাথা-ভাঙাভাঙির দিনেও নজরুল যে অবলীলাক্রমে শ্যামাসঙ্গীত ও বৃন্দাবন-গাথা রচনা করে চলেছেন, তৌহীদেরও (একেশ্বর-তত্ত্ব) শক্তিশালী ব্যাখ্যা দিতে পারছেন, তার রহস্য নিহিত রয়েছে তাঁর এই মূল বিশ্বাসের ভিতরে। কিন্তু এই বিশ্বাস যে তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ বিঘ্নও ঘটিয়েছে সেইটিই আমাদের প্রধান বক্তব্য। কবিদের অথবা শিল্পীদের কেউই হয়ত সর্ব্বপ্রকারে "বিশ্বাস"-বর্জ্জিত নন, কিন্তু তাঁদের বিশেষত্ব এই যে কোনো ব্যক্তি বা বস্তু বা ঘটনার যাথার্থ্য উপলব্ধির আশ্চর্য্য ক্ষমতা তাঁদের থাকে—সেই উপলব্ধির সময়ে তাঁরা যেন সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত রাগদ্বেষবর্জ্জিত ও অপূর্ব্বভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ওঠেন।

এই যে পূর্ণ আত্ম-বিস্মরণ ও বিষয়-নিষ্ঠতা এটি নজরুলের পক্ষে তাঁর শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তেও প্রায় অসম্ভব হয়েছে লীলাবাদে তাঁর অপরিসীম আনন্দের জন্যে। এই লীলাবাদ তাঁর জন্য এক ধরণের আত্মবিস্মৃতি এনে দিয়েছে, তাঁকে আশ্চর্য্যভাবে নিরহঙ্কার ও সৌন্দর্য্য-পিপাসু করেছে, কিন্তু কবিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথে এটি এই বাধা উপস্থিত করেছে যে এর ফলে বহির্মুখী না হয়ে অন্তর্মুখী তিনি হয়েছেন অনেক বেশী; রূপ-বৈচিত্র্য অঙ্কনের চাইতে Type বা প্রতীক সৃষ্টির দিকে তাঁর মন ঝুঁকেছে।

"বিদ্রোহী" কবিতাটি সম্পর্কে আরো একটু আলোচনা হয়ত অসঙ্গত নয়। প্রাক্-"বিদ্রোহী" ও "বিদ্রোহী" যুগের পার্থক্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হয়েছে। "বিদ্রোহী"তেই কবি নিজের শক্তি-সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে ওঠেন। সেই চেতনার দুইটি ধারা—এক দিকে তাঁর অন্তরে জাগে অপরিসীম আত্মপ্রত্যয়, অন্যদিকে তিনি নিজেকে জ্ঞান করেন জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে দুঃস্থ মানবতার অগ্রনায়ক।

এর "বিদ্রোহী" নামকরণ সঙ্গত হয়েছে বলা যায়, কেননা হঠাৎ যে গভীর উন্মাদনা কবির অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছে তা গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে এক তীব্র বিদ্রোহই বটে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে এ এক অপূর্ব্ব উন্মাদনারই কবিতা, কোনো বিদ্রোহ-বাণী এতে বিঘোষিত হয়নি। এর যে বিখ্যাত চরণ "আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান্ বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন" এটিও ঠিক বিদ্রোহ-বাণী নয় বরং এক হিসাবে গভীর ঈশ্বর-নির্ভরতার বাণী।

এ-সম্পর্কে তাঁর এই কালেরই রচনা "দুর্দ্দিনের যাত্রী"র এই কথাগুলো অর্থপূর্ণ:—"......এমন যার কোনো গুরু বা বিধাতা নেই যাকে ভয় বা ভক্তি করে সে নিজের আত্মাকে ফাঁকি দেয় শুধু সেই সত্য স্বাধীন, মুক্ত স্বাধীন। এই অহম্-জ্ঞান আত্মজ্ঞান—অহঙ্কার নয়, এ হচ্ছে আপনার ওপর—নিজের বিপুল শক্তির ওপর অটল বিরাট বিশ্বাস"......অন্যত্র......"যার অন্তরে আপন সত্য আপন ভগবান্ সহজে জাগে না তাদের ভগবান্ এম্‌নি করে বুকে লাথি খেয়ে তবে জাগে"......অন্যত্র.........
"বিদ্রোহের মতো বিদ্রোহ যদি করতে পার, প্রলয় যদি আন্‌তে পার তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই - কল্যাণ আসবেই।"

দুর্ব্বল এমন কি অনাবশ্যক চরণ থেকে "বিদ্রোহী" মুক্ত নয়। এ ত্রুটি মারাত্মক। কিন্তু এত ত্রুটি সত্ত্বেও বাংলা কাব্যে "বিদ্রোহী"র জন্য যে একটি সম্মানিত স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে তা যথার্থ। রবীন্দ্রনাথের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে"র মতো বিদ্রোহীরও সংস্কার-সাধন সম্ভবপর ও কর্ত্তব্য বলে মনে হয়।

যে লীলাবাদে বিশ্বাস কবির মজ্জাগত বলেছি তারও সঙ্গে আমাদের প্রথম স্পষ্ট পরিচয় হচ্ছে এতে, বিশেষ করে এর এই সব চরণে—

জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ
স্বর্গ পাতাল মর্ত্ত্য।

আমি উন্মাদ আমি উন্মাদ—
আমি চিনেছি আমারে আজিকে আমার খুলিয়া
গিয়াছে সব বাঁধ।

"বিদ্রোহী"তে কবির ঈশ্বর-বিদ্রোহ প্রকাশ পায়নি বটে, কিন্তু এর পরের "ধূমকেতু" কবিতায় সে-বিদ্রোহ পুরোপুরি প্রকাশ পেয়েছে—

জানি ঐ ভুয়ো ঈশ্বর দিয়ে হয়নি যাহাও হবে তাও,
তাই বিপ্লব আনি বিদ্রোহ করি·············
ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, রাশিয়ার সাম্যবাদের দিকে কবি এখানে বিশেষ-ভাবে ঝুঁকেছেন বোধ হয় তাঁর এই সময়ের প্রধান বন্ধু কমরেড মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদের প্রভাবে। তাঁর "বিদ্রোহী" যুগের প্রায় সমস্ত কবিতায় এই সাম্যবাদের প্রভাব লক্ষ্যযোগ্য। কিন্তু পূরোপূরি সাম্যবাদী নজরুল কখনো হননি, হলে তাঁর এই সাম্যবাদ প্রচারের দিনে 'খালেদ' 'উমর' 'জগ্‌লুল' প্রভৃতি প্যানইস্‌লামী ভাবের কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হতো না। সাম্যবাদের প্রভাবে তাঁর ভিতরে ঘনীভূত হয়েছে দুঃস্থ ও বঞ্চিত মানবতার জন্য তাঁর দরদ। তাঁর ঈশ্বর-দ্রোহ মানব-সমাজের দুর্ব্বল ন্যায়-অন্যায়-বোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—অভিমানের ভঙ্গিতে; তার বেশী কিছু বলে মনে হয় না।

তৃতীয় স্তর

"বিদ্রোহী" যুগ নজরুল সাহিত্যের আলোচনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেননা তাঁর জনপ্রিয়তার মূলে এই যুগের রচনা। কিন্তু এই যুগ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এই বিদ্রোহী যুগের উদ্দীপনা পূর্ণ পরিণতি লাভ করবার পূর্ব্বেই বিস্মিত দেশবাসী তাঁর কণ্ঠে শুনতে পেল—"বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল" অথবা "আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী" ইত্যাদি গজল।

"বিদ্রোহী" যুগ নজরুলের জন্য জনপ্রিয়তা আনলেও তাঁর কাব্য-সাধনা এ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর গানে এ বিষয়ে বাংলার কাব্যরসিকরা বোধ হয় একমত। রেখাপাতের যে অপরিচ্ছন্নতা "বিদ্রোহী" যুগের রচনায় লক্ষ্য করা গেছে তা যে "গানে"র যুগে প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে, শুধু অনবদ্য চরণ নয় অনবদ্য কবিতা তাঁর কলম থেকে উৎরেছে, তা মিথ্যা নয়। তাঁর রচিত গান সম্বন্ধে একটি উপভোগ্য রচনা তাঁর "বুলবুল" সঙ্গীত-গ্রন্থের ভূমিকারূপে ব্যবহার করা হয়েছে। লেখক তাতে নজরুলের অনেক চরণের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তা সমর্থনযোগ্য। শুধু একটি ব্যাপার তিনি সেখানে লক্ষ্য করেন নি, সেটি এই যে, নজরুলের এই সব সুন্দর প্রেমের কবিতা সংখ্যায় কম, আর শীগগিরই পুনরুক্তি দোষ তাঁতে ঘটেছে। Type বা

প্রতীক স্মৃষ্টির দিকে তাঁর যে বিশেষ ঝোঁক তারও প্রমাণ এই সব গানে রয়েছে।

যিনি খ্যাতি লাভ করলেন বিদ্রোহী রূপে কাব্য-লক্ষ্মীর সত্যকার প্রসাদ তিনি লাভ করলেন প্রেম-সঙ্গীত রচয়িতা রূপে! বাংলা সাহিত্যে এ ব্যাপারটি কিন্তু নতুন নয়। বীররস, মহাকাব্য, এসব বাংলার ধাতে যেন সহ্য হয় না। মধুসূদন বিরাট আয়োজন করলেন, কিন্তু সে-চেষ্টায় বীররস যতখানি স্মৃষ্টি হলো তার চাইতে অনেক বেশী হলো করুণ রস। হেম নবীন ত নাস্তানাবুদ হলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার এই ধাত বুঝে এ পথে পা দিলেন না, তবে নিজের বিরাট জীবন-সাধনার গুণে অজানিতভাবে বীররসের স্মৃষ্টি করলেন কোনো কোনো কবিতায়—যেমন "বর্ষশেষে"। হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম রণ-দামামা আর লেফ্‌ট্ রাইট্ মার্চ্চের ধ্বনি কানে নিয়ে ঘরে ফিরলেন। এর সঙ্গে তাঁর নতুন উন্মাদনা লাভ হলো রাশিয়ার লাল-পল্টনের রণহুঙ্কারে। এই বিপুল উত্তেজনা ও উন্মাদনা যে তাঁর কাব্য-প্রয়াসে একেবারে ব্যর্থ হলো তা বলা যায় না, কিন্তু সার্থকতা যা লাভ হলো চেষ্টার অনুপাতে তা কত সামান্য! অথচ করুণ রস, বিরহ, এসব বাংলায় জমে ওঠে যেন সহজে। সেকালে চণ্ডীদাস অমর বিরহ-গাথা রচনা করে গেছেন, বাংলার মাঠে বাটে আজো তার ধুয়া শোনা যায়। এর কারণ মনে হয় বাংলার বিশেষ জীবন-ধারা। বৃহত্তর জীবন স্মৃষ্টির চেষ্টা বাংলায় যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু

কেমন করে যেন সে-সব শেষ পর্য্যন্ত জমে ওঠে নি। শেষ পর্য্যন্ত বাঙালীর অবলম্বন হয়েছে তার নগণ্য গৃহ, তার বহতা নদী, তার সবুজ গাছপালা, ফসল ক্ষেত আর নীল আকাশ, আর তার প্রেমময়ী নারী। এই পরিবেষ্টনে বীররস আর মহাকাব্য যদি না জমে তবে দুঃখ করা চলে না। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, বাংলার যে আবহমান প্রাণ-ধারা তার সঙ্গে নজরুলের যোগ আশ্চর্য্যভাবে নিবিড়।

নজরুল যে প্রেম-সঙ্গীত রচনা করেছেন তা বুঝতে গেলে সহজেই চোখে পড়ে, তাঁর বাঁধন-হারা পত্রোপন্যাসে তাঁর প্রথম জীবনের যে ব্যর্থ প্রেমের ছবি তিনি অঙ্কিত করেছিলেন সেইটিই হয়ে রয়েছে তাঁর সারা জীবনের ধুয়া। কিন্তু তাঁর প্রেম যেমন রাধিকার "তনু-মন-ধন জীবন যৌবন তব পায়ে সমর্পণে"র প্রেম নয় তাঁর বিরহও তেম্‌নি রাধিকার বুকভাঙা বিরহ নয়। যে-বিরহচ্ছবি তাঁকে মুগ্ধ করেছে সেটি সংসার-অনভিজ্ঞ, অবুঝ, কিশোর-কিশোরীর বিরহ। এ বিরহে তাদের জীবন যে ব্যর্থতায় তিক্ত হয়ে উঠেছে ঠিক তা নয়, হয়ত দৈনন্দিন জীবন তাদের চলেই যাচ্ছে, কিন্তু এ বিরহ-বোধ তাদের জন্য হয়েছে যেন জীবনের এক অতুলনীয় অভিজ্ঞতা—জীবন যেন পরম সমৃদ্ধ হয়েছে এই বিরহের স্পর্শমণির ছোঁয়ায়। ভাব-বিলাসিতা বলে এই বিরহের নিন্দা যে না করা যায় তা নয়; পরবর্ত্তীকালের সমঝদারদের জন্য এই বিরহ-ছবি আজকার মতো এতখানি মনোরম নাও হতে পারে; কিন্তু এ সত্য যে কবির

সমসাময়িকেরা কবির এই বিরহসঙ্গীত নিবিড়ভাবে উপভোগ করেছেন ও করছেন; এর প্রভাব বাংলার সমসাময়িক গানের উপরেও অসামান্য।

এই সব প্রেমসঙ্গীত রচনার সঙ্গে সঙ্গে নজরুল ইসলামী সঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত ও বৈষ্ণব সঙ্গীত রচনায় মন দেন। ইসলামী সঙ্গীতের অধিকাংশ প্রচলিত উর্দ্দু গজল ও "নাতিয়া"র (প্রশস্তি) ভঙ্গিতে রচিত। কবির নিজের কাছে এই সব সঙ্গীত যথেষ্ট মূল্যবান্ কেননা এই সব সঙ্গীতের ভিতর দিয়েই বাংলার মুসলিম জনসাধারণের চিত্তে তিনি প্রবেশ-পথ পেয়েছেন। মুসলিম জনসাধারণও এতে যে কিছু প্রীত না হয়েছে তা নয়। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে কবির সঙ্গে একমত হতে নারাজ। একশ্রেণীর সুফীর যে উৎকট গুরুভক্তি মুখ্যতঃ তাইই রূপ পেয়েছে এই সব গানে। ভাববিলাসিতাও এসবে প্রচুর। কিন্তু মনে হয়, ধর্ম্ম সম্পর্কে এই ভাববিলাসিতার দিন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এর চাইতে হজরত মোহম্মদের সবল কাণ্ডজ্ঞান, চরিত্র-মাহাত্ম্য, এসব কেন্দ্র করে যদি গান রচনা সম্ভবপর হতো তবে তার সার্থকতা হতো অনেক বেশী। ইসলাম এক হিসাবে ধর্ম্ম-জগতে এক বিদ্রোহের সূচনা করেছে প্রতীক-চর্চ্চায় আপত্তি জানিয়ে; আর বিদ্রোহী যে তার সত্যকার মহিমা নিরন্তর বিদ্রোহে।

ইসলামী সঙ্গীতের চাইতে শ্যামাসঙ্গীত রচনায় নজরুল সার্থকতা অর্জ্জন করেছেন অনেক বেশী। বাংলার শ্যামাসঙ্গীত বাংলা সাহিত্যের এক গৌরবের বস্তু, বিশেষ করে রামপ্রসাদের

শ্যামাসঙ্গীত। কিন্তু বাংলার প্রচলিত শ্যামাসঙ্গীতের মধ্যে নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতে একটি বিশিষ্টতা ফুটেছে। কাব্যে রূপ-বর্ণনা একই সঙ্গে রূপ ও অরূপের বর্ণনা। কিন্তু অধিকাংশ শ্যামাসঙ্গীতে—যেমন অনেক ধর্ম্মসঙ্গীতে—রূপ স্থূল হয়ে উঠেছে, অরূপের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বড় বেশী। কিন্তু নজরুলের কোনো কোনো শ্যামাসঙ্গীত উপভোগ্য কবিতা হয়েছে।

বৈষ্ণব সঙ্গীতে শ্যামাসঙ্গীতের মতো সাফল্য সাধারণতঃ নজরুলের লাভ হয়নি। তার কারণ বোধ হয় তাঁর অনুভূত প্রেমের চাঞ্চল্য। বৈষ্ণব পদকর্ত্তারা এক্ষেত্রে এত বড় সাফল্য অর্জ্জন করে গেছেন যে তাঁদের পরে তাঁদেরই ভঙ্গিতে তাঁদের সেই গান জমানো সুকঠিন। কিন্তু সম্প্রতি নজরুল যে অনুভূতির ভিতর দিয়ে চলেছেন তার ফলে তাঁর এখনকার বৈষ্ণবসঙ্গীত অপরিসীম মাধুর্য্য-মণ্ডিত হয়ে দেখা দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় তাঁর অধুনা-রচিত "অভিসার" সঙ্গীত-সমষ্টি। প্রেমের চাঞ্চল্য, দেহ-চেতনা, এসব আশ্চর্য্য ভঙ্গিতে উঠে গেছে এক উন্নততর স্তরে। তাঁর এখনকার প্রেমের গান পূর্ণ আত্মনিবেদনের গান হয়ে উঠেছে, এবং মনে হয়, তাঁর পূর্ব্বের অনেক শ্রেষ্ঠ প্রেমসঙ্গীত তাঁর এখনকার ভাবধারার আলোকে নূতন মহিমা লাভ করেছে।

তবে তাঁর আধুনিক জীবনের পরিণতি কোথায় বলা সোজা নয়। এর ফলে তাঁর কবি-জীবনের অবসান ঘটাও বিচিত্র নয় —যে তাত্ত্বিকতা তাঁর জীবনের মর্ম্মমূলে আমরা দেখেছি তাই

হয়ত জয়ী হবে পূর্ণভাবে। অথবা, এর ফলে সমৃদ্ধতর চিত্ত ও তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি নিয়ে তিনি নূতন করে জীবনে ও সাহিত্যে প্রবেশ করতে পারেন।

নজরুলের দীর্ঘ ও বিস্তৃত সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করতে চেষ্টা পাওয়া গেল। আমাদের প্রধান বক্তব্য এই হয়েছে যে কবি হিসাবে নজরুল সাফল্য অর্জ্জন করেছেন প্রধানতঃ তাঁর গানে। কিন্তু তাঁর বিখ্যাত "বিদ্রোহী" যুগের সাধনা তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবিপদবাচ্য না করলেও একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে তাঁর দেশ ও জাতির সামনে তাঁকে উপস্থাপিত করেছে—বেদনালাঞ্ছিত মানবতার যে অকুণ্ঠিত জয়গান তিনি করেছেন তাতে দেশের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের সহায়তা হয়েছে।—আরো বলতে চেষ্টা করা হয়েছে যে আজো নজরুলের ভাব-জীবনের অবসান হয় নি।

যে নূতন জীবন একালে কবির ভিতরে সূচিত হয়েছে, কেউ কেউ তাকে মনে করছেন পাগলামি। তা মনে করবার হেতু ঠিক নেই কেননা এই ধরণের অনুভূতি যুগে যুগে মানুষের জীবনে এসেছে। তবে এর পরিণতি যে বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত দুইই হতে পারে—অবশ্য সাহিত্যের দিক থেকে—তার ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কবি নিঃসঙ্গ ব্যক্তি নন—কোনো সমাজের বা জাতির তিনি প্রতিনিধি। নজরুল এ-যুগের বাঙালী জাতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন প্রধানতঃ জড়তার বিরুদ্ধে বার বার সংগ্রাম ঘোষণা করে ও নির্য্যাতিত জনসাধারণের পক্ষ সমর্থন করে; আর মুসলমান-সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাদের মনে নব নব আশা-

উদ্দীপনার সঞ্চার করে, বিশেষ করে বাংলার বা ভারতের আবহমান প্রাণ-ধারার সঙ্গে তাদের প্রেমের নিবিড় যোগ স্থাপন করবার আহ্বান জানিয়ে।

কবি একই সঙ্গে জ্ঞানী ও প্রেমিক। জ্ঞানী যদি তিনি কিছু কম হন তবু খুব ক্ষতি হয় না, কিন্তু প্রেমিক হওয়া চাই তাঁর পূরোপূরি। সেই প্রেমের সাধনাই মুখ্যতঃ নজরুলের সাধনা হয়েছে। দেশ ও জাতির প্রতি সেই প্রেমে, সেই পূর্ণ আত্মনিবেদনে নজরুল একালের মুসলমানদের মধ্যে, অথবা হিন্দু-মুসলমান সবার মধ্যে, এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি—যে বৃহৎ জীবনের অথবা জাতীয় জীবনের চেতনা দেশে অনুভূত হয়েছে তাতে তাঁরও প্রতিভার স্পর্শ লেগেছে। এই দিক দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, নজরুলের ঐতিহাসিক মর্য্যাদা কত বড়।—আর কোনো যুগের ঐতিহাসিক মর্য্যাদা যাঁর লাভ হয়েছে চিরকালের মর্য্যাদাও তাঁর লাভ হয়েছে, এ কথা বলা যায়।

১৩৪৮